# ফাঁসির মঞ্চে যারা...

পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা কর্তৃক নতুন সিলেবাস অনুযায়ী লিখিত [illegible] ও [illegible] শ্রেণীর বাংলা উপপাঠ্য।



# ফাঁসির মঞ্চে যারা...


সন্দীপ সেন

শিক্ষক বেলেঘাটা শান্তিসংঘ বিদ্যায়তন ( বালক ) বেলেঘাটা, কলি-২০।
প্রাক্তন শিক্ষক কোতলপুর উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বাঁকুড়া; রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম, রহড়া, ২৪-পরগনা। বিভিন্ন পত্র/পত্রিকায় নিয়মিত শিশুসাহিত্যের লেখক ও সমালোচক।



—ঃ পরিবেশক ঃ—

আনন্দমেলা

৩৭এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

সূচীপত্র



মূল্য ঃ ছয় টাকা মাত্র।




এ. বসু ও এস. চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দমেলা, ৩৭এ, কলেজ রো কলিকাতা-৯ হইতে প্রকাশিত এবং
আশীষ চৌধুরী, জয়দুর্গা প্রেস, ১৬ হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।



# ফাঁসির মঞ্চে ক্ষুদিরাম

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ক্ষুদিরামের নাম রক্তাক্ষরে লেখা আছে। অহিংসার মাধ্যমে ভারত স্বাধীন হবে এই মতবাদে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না।

ক্ষুদিরাম যখন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তখন বাংলাদেশের তরুণদের মনে ভারত স্বাধীন করার আকাঙ্ক্ষা তীব্র ছিল। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের রাজপথে নেমে আসার ঘটনা তরুণদের অনুপ্রাণিত করেছিল।

কোলকাতার চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংস ফোর্ড বিপ্লবীদের চোখে পয়লা নম্বরের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত হল।

ফোর্ড ষোল বৎসরের ভারতীয় কিশোরকেও শাস্তি না দিয়ে ছাড়েনি। সেই কিশোরের নাম ছিল সুশীল কুমার সেন।

অরবিন্দের নেতৃত্বে সিদ্ধান্ত হল কিংসফোর্ডকে হত্যা করা হবে। প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হল। তারপর মেদিনীপুরের বিপ্লবী হেমচন্দ্রের পরামর্শে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর ওপর কিংসফোর্ডকে হত্যা করার দায়িত্ব দেওয়া হল। "জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি দমনে কিংসফোর্ড যে তৎপরতা দেখাইয়া ছিলেন তাহার শাস্তি দিবার জন্য ক্ষুদিরাম চঞ্চল হইয়া উঠেন এবং মজঃফরপুরে গমন করিয়া বোমার আঘাতে কিংসফোর্ডকে জীবনান্ত করিতে চাহেন। তার মৃত্যু দেশের লোকেরও অভিপ্রেত ছিল বলিয়াই আমার বিশ্বাস।" উহাই দেশের দাবি। হেমচন্দ্র ও উল্লাসকর এই বোমা ১৫নং গোপীমোহন দত্ত লেনের বাড়িতে প্রস্তুত করেন। একটি কাঠের হাতলযুক্ত টিনের আধারে এই ডিনামাইট বোমাটি ছিল। উপেন্দ্র ও অন্যান্য সকলে স্থির করিলেন যে এই কাজের ভার ক্ষুদিরামকে দেওয়া হবে, এবং চাকী হবে তার সঙ্গী।

তাদের দুইজনকে দুটি রিভলবার দেওয়া হয়, কারণ ধরা পড়িবার উপক্রম হইলে তাঁহারা ধরা না দিয়ে আত্মহত্যা করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছিল।

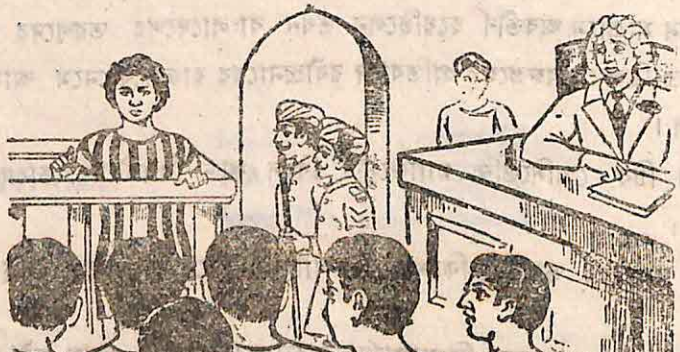
স্থান মজঃফরপুর। সময় মার্চ মাসের এক সন্ধ্যা। ক্ষুদিরাম ও তার সাথী ছদ্ম নামে একটি ধর্মশালায় উঠলেন। কিংসফোর্ড তখন মজঃফরপুরে। তাঁরা কিছুদিন যে অঞ্চলে ছিলেন তার পথঘাট চিনে নিলেন।

লক্ষ্য রাখলেন কিংসফোর্ডের গতিবিধির ওপর।

কিংসফোর্ডের বাড়ীর কাছেই ছিল ইওরোপীয়ান ক্লাব। ঘোড়ার গাড়িতে করে কিংসফোর্ড ক্লাবে যেত প্রতি সন্ধ্যায়। এক শ্বেতাঙ্গ উকিল মিঃ কেনিডি স্ত্রী ও মেয়েকে সঙ্গে করে ক্লাবে আসত ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে। গোয়েন্দা পুলিশ টের পেয়ে যায় কিংসফোর্ড আক্রান্ত হবে।

৩০শে এপ্রিল ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দ। ঘুটঘুটে অন্ধকারে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী বোমা নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। একটি ঘোড়ার গাড়ী দেখেই বোমা ছুঁড়লেন। প্রচণ্ড আওয়াজে গাড়িটি চুর্ণ বিচুর্ণ হয়ে গেল। স্ত্রী কন্যা সহ ঐ গাড়ির আরোহী কেনেডির মৃত্যু ঘটল।

বোমা নিক্ষেপ করেই ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী সেই রাত্রেই তেইশ মাইল হেঁটে এবং ছুটে পেরিয়ে যান। ক্ষুধায় ক্লান্তিতে সমস্তিপুরের আগে উইলি নামক স্টেশনে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন ক্ষুদিরাম। প্রফুল্ল চাকী পালিয়ে গিয়ে নিজের রিভলবারের গুলিতে আত্মহত্যা করেন।



ক্ষুদিরামের বিচার

ক্ষুদিরাম ও চাকীর বীরত্ব চারিধারে ছড়িয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেল ক্ষুদিরামের বিচার মজঃফরপুরের এজলাসে। বিচারের সময় কোর্টের কাছে জনসমুদ্র ভেঙ্গে পড়ত। ক্ষুদিরাম নির্ভীকভাবে অপরাধ স্বীকার করলেন। ফলে বিচারপতি কার্নডাফ ক্ষুদিরামের ফাঁসির হুকুম দিলেন।

১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে ১১ই আগস্ট মজঃফরপুরের কারাগারে ক্ষুদিরাম ফাঁসির মঞ্চে উঠলেন। এই সময়ের বর্ণনা পড়ে মনে হয় ক্ষুদিরাম দৃঢ় পদক্ষেপে ফাঁসির মঞ্চের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন।

ক্ষুদিরামকে দেশের সাধারণ মানুষ যে কত ভালোবাসতো তার একটি উদাহরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে। সরকারী কর্মচারী ভগিনীপতির আশ্রয় থেকে বিতাড়িত হয়ে ক্ষুদিরাম সৈয়দ আবদুল ওয়াজেদ নামে এক উকিলের বোনের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ক্ষুদিরামের প্রতিটি পদক্ষেপের ওপর পুলিশের এত কড়া নজর ছিল যে তাঁর ভগিনীপতিও তাঁকে বাড়ীতে রাখতে সাহস করেন নি। সেই সময় এই মুসলিম রমণী তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলন। ক্ষুদিরাম যখন মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্তি আসামী তখন এই রমণী ছুটে এসেছিলেন তাঁকে দেখতে।



# মথুরা সিং

ভারতের বিপ্লবী আন্দোলন মহারাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তার ঢেউ লেগেছিল পাঞ্জাবেও। পাঞ্জাবের বীর বিপ্লবীরা শুধু দেশের মধ্যে বিপ্লবী আন্দোলনে জড়িয়ে ছিলেন তা নয়, বিদেশ থেকেও ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামকে দৃঢ়তর করার প্রয়াস পেয়েছিলেন।

রুজি-রোজগারের উদ্দেশ্যে যাঁরা আমেরিকায় গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে পাঞ্জাবীদের সংখ্যাই ছিল বেশী। গোলামীর শৃঙ্খল থেকে ভারতীয়দের মুক্ত করার উদ্দেশ্যে গঠন করলেন গদর পার্টি। গদর পার্টির সংগঠন কিছুদিনের মধ্যেই ভারতীয়দের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং দেখতে দেখতে একটা ভালো দেশ-ভক্তদের সংগ্রামী সংগঠন গড়ে ওঠে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে। ঐ সালেই ৪ঠা আগস্ট এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল ব্রিটিশ। এই সুযোগটা ছিল গদর পার্টির পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ। গদর পার্টির সদস্যরা ঠিক করল হাজার হাজার প্রবাসী ভারতীয়দের ভারতে পাঠিয়ে ইংরেজদের তাড়ানোর সংগ্রামকে দৃঢ়তর করবে। আমেরিকায় ওরা প্রকাশ্যে ব্রিটিশ বিরোধী কথাবার্তা বলত। গদর পার্টি সিদ্ধান্ত করল তার প্রত্যেক সদস্য ভারতে গিয়ে পার্টির উদ্দেশ্য সফল করবে। যে সব সংগঠকের প্রবল ব্যক্তিত্ব এবং নিরলস প্রয়াসের ফলে গদর পার্টি গড়ে উঠেছিল তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ডাঃ মথুরা সিং।

মথুরা সিং-এর জন্ম পাঞ্জাবের কেবাল গ্রামে ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে। সেখানে স্কুলের পাঠ শেষ করে রাওয়ালপিণ্ডিতে ডাক্তারী পড়ে কিছুকালের মধ্যে ডাক্তার হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তিনি আমেরিকায় যান। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি চলে এলেন সংহাই। সেখানে তিনি প্রচুর রোজগার করলেন। তারপর তিনি গেলেন কানাডায়। এই কানাডাতেই গদর পার্টির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ভারতে ফিরে যেতে ইচ্ছুক এমন ভারতীয়দের সঙ্গে ইমিগ্রেশন বিভাগের অধিকারীদের মতবিরোধ হয়। তারপর ঝগড়া বিবাদ। ঠিক সেই মুহূর্তে ডাঃ মথুরা সিং অনুভব করেন পরাধীনতার জ্বালা। তারপরেই গদর পার্টির সিদ্ধান্ত হল ভারতীয়রা ভারতে ফিরে যাবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি ভারতে ফিরে এলেন।

ভারত থেকে গেলেন সাংহাই। সাংহাই পৌঁছে সেখানেও গঠন করলেন গদর পার্টি। তারপর ফিরে এলেন পাঞ্জাবে। তৎকালে তিনি ছিলেন পাঞ্জাবের বড় সংগঠক। সরকার ধড় পাকড় শুরু করেছিল। ডাঃ মথুরা সিং সি. আই. ডি-র চোখে ধুলো দিয়ে দেশ থেকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। সোজা পথে পালানোর অসুবিধা ছিল। তাই তিনি ওয়াজিরাবাদ দিয়ে পালাবার সময় পুলিশের খপ্পরে

পড়ে যান। সেখান থেকে ছলে বলে কৌশলে পালাতে সক্ষম হন। সেখান থেকে ট্রেনে করে পালাবার সময় হঠাৎ ট্রেন থামিয়ে দিয়ে তল্লাসী শুরু হয়, তখনও তিনি পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কাবুলে পালাতে সক্ষম হন। কাবুলে তিনি চিফ্ মেডিকেল অফিসারের পদে নিযুক্ত হন।

কাবুলে গঠিত হল ভারতের অস্থায়ী সরকার। নেতৃত্বে ছিলেন রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ সিং এবং মৌলানা বরকতুল্লা। জার্মান কমিটি এই সরকার গঠনে সাহায্য করে। এই অস্থায়ী সরকার গঠিত হল ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে এই ঘটনা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। এই অস্থায়ী সরকার ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে নানা দিক থেকে সাহায্য করে। আফগানিস্থান সরকার ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

ডাক্তার মথুরা সিং এই অস্থায়ী সরকারের অন্যতম নেতা ছিলেন। এক বিশেষ কাজের জন্য ডাঃ মথুরা সিং কাবুল থেকে রাশিয়া যাচ্ছিলেন। সেই সময় বিশ্বাসঘাতকতা করে তাসখন্দে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁকে বন্দী করে ইংরেজ সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সেখান থেকে তাঁকে ইরানে নিয়ে আসা হয়। ইরানে তাঁকে ব্রিটিশে বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে আটকে রাখা হয়।

সেই সময় অনেক গুলো মিথ্যা অভিযোগ সাজিয়ে তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। দণ্ডাদেশ হওয়ার পর তাকে একটুও বিচলিত দেখা গেল না। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দেই ১৭ মার্চ ডাঃ মথুরা সিং এর ফাঁসি হয়।





# দীনেশ চন্দ্র গুপ্ত

মাত্র কুড়ি বছর বয়সের বাঙালী যুবক দীনেশচন্দ্র গুপ্ত হাসি মুখে ফাঁসির মঞ্চে উঠে পড়লেন। ভাবটা যেন কৌতূহলী অদম্য উৎসাহে খেলার মঞ্চে উঠেছে। হয়ত মৃত্যুর চোখে জল ছিল কিন্তু দীনেশের চোখে জল ছিল না। মৃত্যু যেন তার কাছে জীবনের আর এক নাম। বাবা, মা, বোন এমনকি বৌদিকে সব সময় মৃত্যু সম্পর্কে এমন কথা বলত যেন মৃত্যু তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। মৃত্যু তার কাছে ছিল মরণমালা। যৌবনে পা দিতে না দিতেই, সারা দেশের আপত্তি সত্ত্বেও দীনেশচন্দ্র গুপ্তকে মৃত্যুবরণ করতে হল।

দীনেশচন্দ্র বিপ্লবীবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এক ইংরেজ অফিসারকে হত্যার অপরাধে তাঁকে বন্দী হতে হয়। শুধু বাংলার নয় সারা ভারতবর্ষের মানুষের অনুরোধ সত্ত্বেও দীনেশচন্দ্রকে ইংরেজরা প্রাণদণ্ড দেয়।

গান্ধী আরউইন চুক্তির পর লোকের ধারণা হলো সরকারের মনোভাবের কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। কোলকাতা হাইকোর্টের বিদগ্ধ বিচারপতি জাস্টিস অকল্যাণ্ডের কথা শুনে লোকের ধারণা আরও দৃঢ়বদ্ধ হল। দীনেশচন্দ্রের বাবা মায়ের আর্জি সরকারের কাছে পৌঁছে দিল না ইংরেজ অফিসাররা।

ঢাকা জেলার এমন একটি গ্রামে দীনেশচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল যে গ্রামে ব্রাহ্মণ ছিল বেশী এবং বৈদ্য ও কায়স্থ ছিল কম। দীনেশচন্দ্রের পিতার নাম ছিল সতীশচন্দ্র গুপ্ত। দীনেশচন্দ্র ছিলেন পিতামাতার তৃতীয় সন্তান।

সতীশচন্দ্র ছিলেন মেদিনীপুর জেলার জ্বালাপুরের পোস্টমাস্টার। বালক অবস্থার দীনেশচন্দ্রের

তেমন কোন বৈশিষ্ট ছিল না। আর চারজন ছাত্রর মতই দীনেশচন্দ্র লেখাপড়ায় ভাল ছিলেন। খেলাধূলা ভালবাসতেন। খেলার চেয়ে পড়ার দিকে যেন ঝোঁকটা ছিল বেশী। পাঠশালা থেকে কলেজ পর্যন্ত পণ্ডিতমশাই থেকে অধ্যাপক পর্যন্ত প্রত্যেকেই দীনেশের লেখাপড়ায় সন্তুষ্ট ছিলেন। ঢাকার একটি হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে কলেজে পড়ার সময় অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। সেই সময় দীনেশচন্দ্র বি. এ. পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরী হচ্ছেন। লেখাপড়ায় ছেদ পড়ল। দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দীনেশচন্দ্রের বড়দা জ্যোতিষচন্দ্র গুপ্ত মেদিনীপুরের দেয়ানের উকিল ছিলেন। মেজদা পৃথ্বীশচন্দ্র ছিলেন ডিব্রুগড়ের মরিয়ানো নামক জায়গায় ডাক্তার। মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল মাত্র কুড়ি বৎসর কয়েক মাস।

১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর বাংলার জেল ইনস্পেক্টর, লেফটেনান্ট কর্নেল এন. এস. সিম্পসনের কোলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং-এ মৃত্যু ঘটে। তৎকালীন খবর বেরিয়ে ছিল এইভাবে।

"দুপুর সাড়ে বারোটার সময় যখন কর্নেল নিজের দপ্তরে বসে ফাইল ঘাঁটাঘাঁটি করছিলেন ঠিক সেই সময় তিনজন যুবক তাঁর ঘরের কাছাকাছি গিয়ে চাপরাশিকে বলেন, আমরা তোমার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই। চাপরাশি জবাব দিল, এখন সাহেব খুব ব্যস্ত আছেন, দেখা হবে না। আপনারা একটা কাগজে আপনাদের নাম, ঠিকানা, উদ্দেশ্য লিখে আমার হাতে দিন। আমি সাহেবের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি। এই কথার কোন উত্তর না দিয়ে বাঙালী যুবকরা চাপরাশিকে ঠেলে ভিতরে ঢুকে যায়, তিনজন যুবককে হঠাৎ ঘরে ঢুকতে দেখে প্রথমে কর্নেল চমকে গেলেন।

তিনজন-এরই পিস্তল একসঙ্গে গর্জে উঠল। সিম্পসন সেই গুলিতে মারা গেলেন।

তারপর তিনজন যুবকই একসঙ্গে গুলি ছুঁড়তে ছুড়তে বারান্দায় এলেন। পরে পাসপোর্ট অফিসে ঢুকলেন। ঐ দপ্তরটার সংলগ্ন ছিল। সেখানে পিস্তলে গুলি ভরে নিয়ে এক আমেরিকান পাদ্রীকে আক্রমণ করলেন কিন্তু সে বেঁচে গেল। তারপর ওরা জুডিশিয়াল সেক্রেটারির ঘরে ঢুকে তার উপর আক্রমণ করলেন। সেক্রেটারির জানুতে গুলি লাগে পরে সে বেঁচে যায়। এই তিন যুবকের একজনের নাম দীনেশচন্দ্র গুপ্ত, দ্বিতীয় জনের নাম বিনয়কৃষ্ণ বসু এবং তৃতীয় জনের নাম সুধীর ( বাদল ) কুমার গুপ্ত। পরে তিনজনই আত্মহত্যার প্রয়াস পান। কিন্তু সুধীরকুমার বাদে অন্য দুজন আত্মহত্যা করতে পারেন নি। শেষ দুইজনকে আহত অবস্থায় মেডিক্যাল কলেজ হসপিটালে ভর্তি করা হয়। কিছুদিন পর বিনয়কৃষ্ণ মারা যায়। হত্যা করতে যাওয়ার সময় ঐ তিন যুবকের পরনে ছিল ইংরেজ পোশাক।" তৎকালীন সংবাদপত্রে এই খবর বেরিয়ে ছিল।

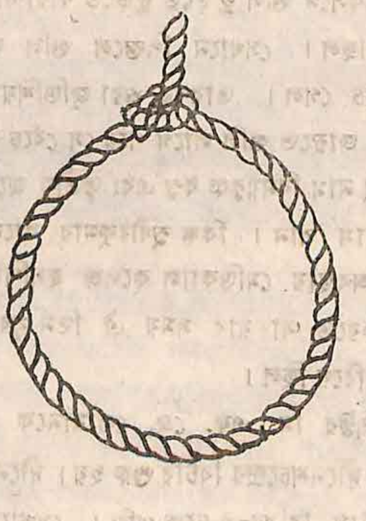
বিনয়কৃষ্ণই বাংলার ইনস্পেক্টর মি. এফ. জে. লোমানকে হত্যা করেছিলেন। ঐ ক্ষত সেরে যাওয়ার পর স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে দীনেশচন্দ্রের বিচার শুরু হয়। দীনেশচন্দ্র নিজেকে নির্দোষী ঘোষণা করে বলেন আমি কৌতূহল বশত রাইটার্স বিল্ডিং-এ ঢুকে পড়ি। সেখানে কি আছে তা আমি জানতাম না। আমি এই শহরে মাত্র দুতিনবার এসেছি। কোন্ বাড়িতে যে কোন্ দপ্তর আছে তা আমি জানি না। ভেতরে ঢোকার পর প্রচণ্ড আওয়াজ কানে এল। আমি ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে ছোটছুটি করতে লাগলাম।

এমন সময় এক ইওরোপীয়ান আমাকে গুলি করে। আমার কাছে কোন সুটকেশ ছিল না। থাকার মধ্যে ছিল দশটি টাকা। ভাগলপুরে আমার বাবা আছেন, আমার তাঁর কাছে যাওয়ার কথা।

শেষ পর্যন্ত ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল রায় দিল দীনেশচন্দ্রের ফাঁসির। তার পর হাইকোর্ট তথা প্রিভি কাউন্সিলে আপিল করা হল। কিন্তু সব জায়গা থেকে একই রায় হতে লাগল। কোলকাতা হাইকোর্টের সহৃদয় ন্যায়াধিকারী অকল্যাণ্ড তাঁর অল্পবয়সের কথা উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু ফল হল না। গান্ধী-আরউইন চুক্তিতে যারা আশান্বিত হয়েছিল তারাও হতাশ হল। শেষ পর্যন্ত তাঁর মা ব্রিটিশ সম্রাটের কাছে আবেদনপত্র পাঠিয়ে ছিলেন, যাতে তাঁর পুত্রের জীবন রক্ষা হয়। কিন্তু সে পত্রও পাঠানো হয়নি। এই বিষয়ে দীনেশচন্দ্রের উকিল অনেক লেখালেখি করলেন। জুডিসিয়াল সেক্রেটারির সঙ্গে দেখাও করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।

যদিও দীনেশচন্দ্র ট্রাইব্যুনালের সামনে নিজেকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করেছিলেন কিন্তু এ থেকে মনে করার কিছু নেই যে তিনি মৃত্যু থেকে ভীত হয়েছিলেন। তিনি হাসি মুখে ফাঁসির মঞ্চে মৃত্যুবরণ করে ছিলেন। ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে ৭ই জুলাই আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে তার ফাঁসি হয়।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে তিনি তাঁর বৌদিকে যে চিঠিগুলো দিয়েছিলেন তাতে কোথাও মৃত্যু-ভয় ধ্বনিত হয়নি।





# ভগৎ সিং

তরুণ ভগৎ সিং বেড়াতে এসেছেন কানপুরে। সেখানে তাঁর পরিচয় হল দুই বাঙালী তরুণের সাথে। তাঁরা হলেন বটুকেশ্বর দত্ত এবং অজয় ঘোষ। ওঁদের মধ্যে আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে আমৃত্যু লড়াই করার বাসনা ছিল তাঁদের মনে।

ভগৎ সিং কথায় কথায় জানালেন ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের পাঞ্জাবের বিপ্লবী নায়ক কর্তার সিং-এর কথা। তাঁর আদর্শ নেতার কথা। তাঁদের মধ্যে গদর পার্টির কাজকর্মের আলোচনাও হয়। তিন তরুণের উদ্যোগে কানপুরে গড়ে উঠল এক ব্যায়ামাগার। কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল ব্যায়ামাগার হয়ে উঠেছে বিপ্লবীদের আস্তানা।

এই সময় হঠাৎ একদিন ইংরেজ পুলিশ 'কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা' নামে বিরাট এক মামলা সাজিয়ে সমগ্র উত্তর ভারতে ধরপাকড় শুরু করে দিল। ভগৎ সিং কানপুর থেকে পাঞ্জাবে ফিরে গিয়ে 'নওজওয়ান সভা' নাম দিয়ে একটি দল গঠন করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের উপযোগী এক দল তৈরী করা। যুবকদের তিনি সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে লাগলেন। ঐ সব যুবকদের দিয়ে নানারকম সামাজিক কাজও করাতেন। ফলে ঐসব যুবকদের উপর সকলের ভালবাসা ছিল। এই সময় ভগৎ সিং-এর যোগাযোগ হল কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী চন্দ্রশেখর আজাদের সঙ্গে। ফলতঃ তাঁর কর্মশক্তি এবং উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে গেল। তিনি গড়ে তুললেন 'হিন্দুস্তান সোস্যালিস্ট রিপাবলিক পার্টি'। এই পার্টির লক্ষ্য ছিল সমাজতান্ত্রিক ভারতবর্ষ গড়ে তোলা। পার্টি ঠিক করল, সময় এবং সুযোগ বুঝে হঠাৎ এমন কাজ করবে যাতে সারা ভারতবর্ষের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয়।

১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে ভারতে এল সাইমন কমিশন। সারা দেশে উঠল, 'সাইমন ফিরে যাও' ধ্বনি। যখন যে

শহরে সাইমন গেল তখন সেই শহরেই হরতাল হল। শোভাযাত্রা বেরুল, পুলিশ লাঠি চালাল। পুলিশের লাঠির আঘাতে শোভাযাত্রার সামনে থেকে লালা লাজপত রায় জ্ঞান হারালেন। কিছুকাল শয্যাশায়ী থাকার পর এই ভারতপূজ্য বৃদ্ধ মারা গেলেন। লাজপত রায়ের মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতবর্ষে প্রতিবাদের ঝড় উঠল। ঠিক এই সময় ভগৎ সিং ঠিক করলেন, তার পার্টির কাজ শুরু করবেন। লাহোরে যে পুলিশ কর্মচারীর পরিচালনায় সেদিন লাজপত রায়কে পুলিশ আঘাত করেছিল সেই কর্মচারির নাম ছিল স্যাণ্ডার্স। তার পদ ছিল পুলিশের সুপারিনটেনণ্ডেন্ট। হঠাৎ একদিন সকালে ভারতবাসী খবরের কাগজ খুলে দেখল, কে বা কারা স্যাণ্ডার্সকে হত্যা করেছে। লোকে বুঝল স্যাণ্ডার্সকে হত্যা করে বিপ্লবীদের দল বদলা নিয়েছে। ভগৎ সিং অহিংসার পথে ভারতবর্ষ মুক্ত হবে এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি রিপাবলিকাল পার্টির সভ্যদের সামরিক কায়দায় গড়ে তুলতে তৎপর হয়ে উঠলেন। অস্ত্র সংগ্রহের উদ্যোগও তাঁর প্রবল ছিল। বাঙ্গালী তরুণ যতীন দাস রিপাবলিকান পার্টির অনুরোধে লাহোরে গেলেন বোমা তৈরীর কাজ শেখাতে। রিপাবলিকান পার্টির উদ্যোগে লাহোরে একটি বোমা তৈরীর কারখানা গড়ে উঠল। একটার পর একটা ঘটনা ঘটিয়ে ভারতবাসীর ঘুম ভাঙ্গানোই ছিল ভগৎ সিং-এর উদ্দেশ্য। সে সময় সরকারের ব্যবস্থা পরিষদে শ্রমিকদের সম্পর্কে একটি বিল নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। শ্রমিকদের দরিদ্র অবস্থার প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্ত স্থির করলেন পরিষদ ভবনের ভেতরে বোমা ফেলবেন। পরিষদের ভেতরে সভ্যদের আসনের পেছনে বোমা ফাটল। গোটা পরিষদ ভবনে আতঙ্ক নেমে এল। যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল। ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্ত পালাতে গিয়ে ধরা পড়লেন। বিচারে তাদের দুজনের যাবজ্জীবন দীপান্তরের দণ্ডাদেশ হল। কোন শাস্তি ভগৎ সিং-এর কাছে ভয়ের কিছু ছিল না। আদালতে যে ভগৎ সিং জবানবন্দী দেন তা তরুণ বিপ্লবীদের মনে যথেষ্ট উদ্দীপনা জাগায়। ভগৎ সিং-এর দেহের গঠন ছিল বলিষ্ঠ এবং সুন্দর। পুলিশ টানা একমাস জেলের ভিতরে রেখে তার উপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছিল। ভগৎ সিং-এর গ্রেফতারের পর লাহোরে বোমা কারখানা পুলিশ আবিষ্কার করে। তারপর ব্রিটিশ সরকার ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্তের বিরুদ্ধে নতুন মামলা গড়ে তুলল। ভারতের ইতিহাসে এই মামলার নাম 'লাহোর ষড়যন্ত্র' মামলা। স্যাণ্ডার্সের হত্যার একমাত্র সাক্ষী ছিল একজন ইংরেজ ইন্সপেক্টর। সে সাক্ষী ভগৎ সিংকে সনাক্ত করতে পারল না।

ফলে মামলা কেঁচে যাওয়ার অবস্থায় এসে গিয়েছিল। অবস্থা বেসামাল দেখে ইংরেজরা লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা নামে একটা অর্ডিনান্স জারি করল। তারপর পাঁচমাস ধরে বিচারের নামে প্রহসন চলল। অবশেষে ১৯৩০-এর অক্টোবর মাসে ভগৎ সিং, রাজগুরু এবং সুকদেবের ফাঁসি হল বাকি সাতজন যাবজ্জীবন দীপান্তর হলেন।

ভগৎ সিং এর প্রাণভিক্ষার দাবি করে অসংখ্য সভা হল। তখন বড়লাট আরউইনের সঙ্গে গান্ধীজীর আপোষ মীমাংসা হল। কেউ কেউ ভেবেছিল এই আপোষ মীমাংসার ফলে ভগৎ সিং-এর প্রাণদণ্ডের আদেশ মুকুব হবে। কিন্তু তাদের আশাকে ব্যর্থ করে ইংরেজ সরকার ভগৎ সিংকে ফাঁসী দিল।



# মাষ্টারদা সূর্য্য সেন

১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের আঠারই এপ্রিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক স্মরণীয় দিন। সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সূর্য সেন তেষট্টী জন বিপ্লবীকে নিয়ে রাত্রে বেরিয়ে পড়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল চট্টগ্রামের সবচেয়ে বড় অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। এ ঘটনা হঠাৎ একদিনে ঘটেনি। তার প্রস্তুতি চলছিল দীর্ঘকাল ধরে। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে সশস্ত্র আক্রমণের মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশ সরকারের হাত থেকে ক্ষমতা দখলের সংকল্প নিয়ে সূর্য সেন ভারতের বুকে বিপ্লবের সূচনা করেন।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনায় তাঁর পাশে সহযোগীরূপে ছিলেন অম্বিকা চক্রবর্তী, নির্মল সেন, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, প্রীতিলিতা ওয়েদ্দার, লোকনাথ বল ইত্যাদি আরও অনেকে।

১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে নাগরখানা পাহাড়ে ব্রিটিশ পুলিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে আহত হয়ে ধরা পড়েন সূর্য্য সেন। পরবর্তী কালে বিচারের সময় উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে ছাড়া পান।

তারপর শুরু হয় তাঁর ফেরারী জীবন। ১৯২৬ থেকে ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁকে আবার বন্দী জীবন যাপন করতে হয়। এই সময়ে কারাগারে বিভিন্ন তরুণ বিপ্লবীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা ও বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে দিয়ে তাঁর ইস্পাত কঠিন দৃঢ় চরিত্র গড়ে ওঠে। তিনি বিশ্বাস করতেন, অহিংসার পথে ইংরেজ শাসকের হাত থেকে ক্ষমতা দখল করা যাবে না। কোন না কোন সময়ে ভারতবর্ষের যে কোন একটি জায়গা থেকে সশস্ত্র বিপ্লব শুরু করতেই হবে। বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন অস্ত্র, জনসমর্থন এবং রসদ। তিনি বিশ্বাস করতেন জনসমর্থন থাকলে বিপ্লবের জন্য রসদের অভাব হবে না। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের শেষ দিকে তিনি জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। এই সময় থেকেই তিনি মাস্টারদা নামে খ্যাত হন।

পুলিশ ও গোয়েন্দাদের সদাসতর্ক সজাগ দৃষ্টি এড়িয়ে এই সময়েই তিনি সুশিক্ষিত যুববাহিনী গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার ফলশ্রুতিস্বরূপ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন।

সেদিনের সেইরাত্রে দশটার সময় দুদিকে দুটি দল চলে গেল অভিযানের সার্থক রূপায়ণে অগ্রবাহিনীর ভূমিকায়। একদল গেল রেললাইন নষ্ট করতে যাতে বাহির থেকে সৈন্য ও পুলিশ দ্রুত এসে বিপ্লবীদের অঙ্কুরে বিনষ্ট না করতে পারে, অন্যদল টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের সংযোগ ছিন্ন করে ভারতবর্ষ থেকে চট্টগ্রামকে সাময়িক বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন। অপেক্ষাকৃত বড় দল নিয়ে গণেশ ঘোষ এবং অনন্ত সিংহ চট্টগ্রাম পুলিশ লাইনের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করলেন। লোকনাথ বল ও নির্মল সেন সহকারী সৈন্যবাহিনীর প্রধান দপ্তর দখল করে নিলেন। পুলিশ লাইনের ব্রিটিশ পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হল। বন্দুকের আওয়াজের মধ্যে দিয়ে উত্তোলন করা হল ভারতের জাতীয় পতাকা। গঠিত হল সুর্য সেনের সভাপতিত্বে অস্থায়ী গণতান্ত্রিক সরকার। অস্থায়ী সরকারের ঘোষণা পত্র জোরে জোরে পাঠ করা হল।

অতর্কিত এই আক্রমণের জন্য ইংরাজ বাহিনী প্রস্তুত ছিল না। বিপ্লবীদের পরিকল্পনা ছিল এরপরই ইওরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করা। কিন্তু অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় ক্লাব থেকে সবাই তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে যায়। সেই সময় বহু ইংরাজদের বাড়ীতে রাইফেল থাকত। তাদের সহায়তায় কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্রিটিশ পুলিশ বিপ্লবী দলকে আক্রমণ করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। পুলিশ লাইনের বিপ্লবীদের ওপর তারা গুলি বর্ষণ শুরু করে। পাল্টা গুলিও তারা প্রত্যুত্তর পায়। অস্ত্রাগার লুট করেও বিপ্লবী বাহিনী কার্তুজ পায়নি। বিভলবার, পিস্তল, গাদাবন্দুক এগুলোর কার্তুজ পেল বটে কিন্তু দুরপাল্লার ম্যাগাজিন রাইফেল, হাল্কা মেসিনগান ইত্যাদি পেয়েও এগুলির জন্য কার্তুজ না পেয়ে তাদের প্রচণ্ড অসুবিধা হল। ফলে সর্বাধুনিক রাইফেল ও মেসিনগানে সজ্জিত আমদানী করা সৈন্যবাহিনীর মোকাবিলা করা শক্ত হয়ে ওঠে। তখন শহর দখলের পরিকল্পনা ত্যাগ করে বনে জঙ্গলে গেরিলা যুদ্ধের কৌশলে লড়াই চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কার্তুজের অভাবে বহু অস্ত্র নষ্ট করে ফেলা হল। পরিকল্পনা ছিল অর্থের জন্য ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক লুঠ করা হবে। সেই পরিকল্পনাও ত্যাগ করা হল। বিপ্লবী বাহিনী আশ্রয় নিল নিকটবর্তী জালালবাদ পাহাড়ে।

এদিকে ঘটনার আবর্তে অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।

চট্টগ্রামের সশস্ত্র বিদ্রোহের খবর রাতারাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। চারদিক থেকে বেশী সংখ্যক সৈন্য চট্টগ্রামের দিকে পাঠানোর নির্দেশ দিল ব্রিটিশ সরকার। বিপ্লবীরাও সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দিতে চাইলো ছোট ছোট সুপরিকল্পিত আক্রমণে। টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বেতার, রেললাইন চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। পুলিশ নির্দয়ভাবে যাকে তাকে গ্রেফতার ও অত্যাচার শুরু করে।

সূর্য সেন ও তাঁর সঙ্গীরা জালালবাদ পাহাড়ের বনে জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে কাটাতে লাগলেন। ২১শে এপ্রিল সূর্য সেন লুকিয়ে শহরে প্রবেশ করেন যোগাযোগ রক্ষার জন্য। এরজন্য তিনি প্রচণ্ড বিপদের ঝুঁকি নিয়েছিলেন। সেই সময় গুপ্তচর মারফত ব্রিটিশ সরকার জানতে পারে জালালবাদ পাহাড়

বিপ্লবীদের বর্তমান আস্তানা। রাতারাতি রেললাইন ঠিক করে ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস্ সুর্মাভেলী লাইটহর্স, রেলওয়ে ফোর্স প্রভৃতির হাজার হাজার গুর্খা সৈন্য চারিদিকে বিভিন্ন জায়গায় মোতায়েন করে জালালবাদ পাহাড় ঘিরে ফেলা হয়। পাহাড়ের উপর চলে অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণ। অবরোধে অবস্থা সঙ্গীন হয়ে ওঠে বিপ্লবীদের। পানীয় জল পর্যন্ত ছিল না। টেগরা ইত্যাদি বিপ্লবীরা শহীদ হন। তার মধ্যেই অনেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

পুলিশ এবার মরিয়া হয়ে উঠল সূর্য সেনকে গ্রেপ্তার করার জন্য। তন্ন তন্ন করে তাঁকে ও তাঁর দলের লোকদের খুঁজতে লাগল।

সেদিনটা ছিল ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই জুন। গুপ্তচরের কাছে খবর পেয়ে ব্রিটিশ পুলিশ ও সৈন্যদল ধলঘাট গ্রামের একটি বাড়ী ঘিরে ফেলল। শুরু হল বিপ্লবী বাহিনী ও পুলিশ দলের মধ্যে গুলির বিনিময়ে গুলি। সূর্য সেনের ডান হাত নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন শহীদ হলেন। ইংরেজ পক্ষের ক্যাপ্টেন ক্যামেরণ গুলি বিদ্ধ হয়ে মারা গেল। তার মধ্যেই সূর্য সেন ও প্রীতিলতা ওয়েদ্দার বেষ্টনী ভেদ করে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

আবার পলাতক ফেরারী জীবন। ১৯৩৩ সালের ২রা ফেব্রুয়ারীর রাত্রে গৈরালায় এক বিশ্বাসঘাতকের চক্রান্তের ফলে আবার সূর্য সেনকে ঘিরে ফেলে ইংরেজ সৈন্যরা। সৈন্যবাহিনীর হাতে সঙ্গীসহ ধরা পড়লেন সূর্য সেন। তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন কল্পনা, শান্তি চক্রবর্তী এবং ব্রজেন সেন।

তার পরের দিনই ঐ বিশ্বাসঘাতককে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলে বিপ্লবীরা। থানার যে অফিসার সূর্য সেনকে ধরার প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল বিপ্লবীরা পরে তাকেও গুলি করে মেরে ফেলেন।

জেলে ভেঙ্গে সূর্য সেনকে মুক্ত করার প্রয়াসও ব্যর্থ হয়। বিচারে সূর্য সেন ও তাঁর সহকর্মী তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসির আদেশ হয়। ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী ভোর বেলায় তাঁদের ফাঁসি দেওয়া হয়। ইংরেজরা এত আতঙ্কিত ছিল যে ফাঁসি দেওয়ার পরও সূর্য সেনের মৃতদেহ কাউকে দেখতে দেয়নি। মৃতদেহটি ওরা যে কি করল তা আজও রহস্যাবৃত।

ফাঁসির আগের দিন গোপনে সূর্য সেন তাঁর সাথীদের নীচের বাণীটি পাঠিয়ে ছিলেন।

"আর্দশ এবং ঐক্যের বাণী আমার বিদায়ের বাণী। আমার প্রিয়তম ভাই ভগিনীগণ, আমার মনের একটি মাত্র স্বপ্নই তোমাদের জন্য আমি রেখে যাচ্ছি। তা হচ্ছে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন—এই স্বপ্নকে পরিপূর্ণতার দিকে আমি কতটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছি জানিনা। আজ তোমাদের বলে যাই—এই কাজ তোমরা এগিয়ে নিয়ে যাবে—এই স্বপ্ন সত্যে পরিণত হবার পূর্বে থেমো না।"

# সাগর পারের শহীদ ধিংরা

সমুদ্র-ঘেরা ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী লণ্ডন। এই শহরের একটি রাস্তার নাম হাইগেট। রাস্তার উপর এক বড় বাড়িতে ঝুলছে 'ইণ্ডিয়া হাউস' লেখা সাইন বোর্ড।

সময়টা ছিল ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দ। এক আঠার বছরের তরুণ সেই বাড়ির সামনে পায়চারী করতে করতে থমকে দাঁড়ালেন। বাড়ীর সামনে পায়চারীরত এক ব্যক্তি তরুণকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি চাও?"

তরুণ কম্পিত স্বরে বললেন, "ইংরাজের হাতে বন্দিনী আমার মাতৃভূমির মুক্তি কল্পে আমি যাহোক কিছু করতে চাই।"

'আচ্ছা আমার সঙ্গে উপরে এস।" কথাবার্তা সব হচ্ছিল ইংরেজীতে। ছেলেটি যার সঙ্গে উপরে গেল তাঁর নাম বি. বি. এস আয়ার। আর সেই ছেলেটি যাঁর দেহের প্রতিটি পদক্ষেপে মুক্তির স্বপ্ন, বিদ্রোহী রক্তের ঝন্‌ঝন্ আওয়াজ তাঁর নাম মদন লাল ধিংরা। পাঞ্জাবের এক ধনী ডাক্তারের পুত্র। অমৃতসর শহর থেকে আই. এ. পাস করে লাহোরে বি. এ. পড়া অসমাপ্ত রেখে ইঞ্জিনীয়ারীং পড়ার নাম করে জাহাজের খালাসী হয়ে পা দিয়েছেন লণ্ডন শহরে। মনে যাঁর অসীম প্রত্যয়। বুকে স্বাধীনতার স্বপ্ন।

ইণ্ডিয়া হাউসের তত্বাবধায়ক বিনায়ক দামোদর সাভারকর তরুণটিকে আলাপ আলোচনায় মাধ্যমে পরীক্ষা করে নিতে চাইলেন। জেনে নিলেন তাঁর পরিচয়। সবশুনে বললেন, "তুমি কি চাও?"

ধিংরা উত্তর দিলেন, "দেশভক্তি অনুশীলন উদ্দেশের জন্য আত্মদানের সুযোগ চাই।"

সাভারকর বললেন, "অসী যুদ্ধের আগে মসী যুদ্ধ। এখন আহারাদি বিশ্রাম করো। তারপর আমাদের লাইব্রেরীতে গিয়ে পড়াশোনা করে নিজেকে তৈরী করে।"

১৯০৭-এর ১০ই মে সাভারকরের পরিচালনায় 'ইণ্ডিয়া হাউস' পালন করে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব। ১৮৫৭-র মৃত বীর যোদ্ধাদের শহীদ অ্যাখ্যা দিয়ে তাঁদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া হয়।

ইণ্ডিয়া হাউসের প্রত্যেকেই পান শহীদদের স্মৃতি অংকিত ব্যাজ। পরদিন ধিংরা বুকে সেই ব্যাজ এঁটে ইউনিভারসিটি কলেজে গেলে কিছু ইংরেজ ছেলেমেয়ে মারমুখী হয়ে তেড়ে আসে তাঁর দিকে। তাদের দাবী "ব্যাজ খুলে ফেলো"। ধিংরা শান্ত দৃপ্ত কণ্ঠে বললেন, "না"। তারা বলল, "তোমাকে অবশ্যই

খুলতে হবে। ওটা আমাদের বিরক্তিকর বস্তু।" ধিংরা বুক ফুলিয়ে বললেন, "চুপ কর, নচেৎ আমি তোমাদের উচিৎ শিক্ষা দিব। এটি আমাদের সম্মান, আমাদের গৌরব।" সেই দৃপ্তভঙ্গীর সামনে যেন পিছু হঠল ইংরেজ ছেলেমেয়েরা।

১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে আলিপুর বোমার মামলার প্রতিবাদে মুখর সারাদেশ। এর উপর গণেশ দামোদর সাভারকর নাসিকের ম্যাজিস্ট্রেট এ. এম. টি জ্যাকসনের বিচারে দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন।

এর প্রতিবাদের শরিক হলেন সাগরপারে ছাত্র ধিংরা। সেই সময় ভারতসচিব লর্ড মর্লি। তার এডিসি কার্জন উইলি লণ্ডনপ্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের তত্বাবধায়ক। উইলি ভারতীয় ছাত্রদের সম্বন্ধে সবসময় অশিষ্ট উক্তি করতেন। অতএব স্থির হল তাকে হত্যা করতে হবে।

১লা জুলাই ১৯০৯ সন্ধ্যা আটটা। লণ্ডনের জাহাঙ্গীর হলে ইম্পিরিয়াল ইনস্টিটিউটে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক অধিবেশন। স্যাভয় হোটেল থেকে সান্ধ্য ভোজ সেরে উইলি চলেছেন সভায়। হলঘর থেকে নামবার সময় উইলি ও ধিংরা মুখোমুখি। স্বাগত অভ্যর্থনা জানিয়ে কথা বলতে বলতে হঠাৎ ধিংরা পিস্তল বার করে উইলির মুখে পরপর পাঁচবার গুলি করলেন। উইলির প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল। ধিংরাকে একজন ইংরেজ ধরে ফেলে। কিন্তু ধিংরা নিজেকে মুক্ত করে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হন। একজন ভারতীয় ছাত্র ধিংরাকে ধরতে যায় কিন্তু পারে না। অবশেষে ধিংরা একজন ইংরেজ পুলিশের হাতে বন্দী হয়। হাতের রিভলবার ছাড়াও ধিংরার কাছে পাওয়া গেল আর একটি গুলিভরা পিস্তল। হত্যার জন্য নির্দিষ্ট আরও কয়েকজন ইংরেজের নাম। যার তলায় লেখা ছিল, "ভারতের স্বাধীনতার জন্য এদের রাজনৈতিক হত্যার একান্ত দরকার।" আর ছিল একটি লিখিত জবানবন্দী। যা ধিংরার মৃত্যুর আগেই ইণ্ডিয়া হাউস প্রকাশ করে। এই বয়ান ইংরেজ মহলে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে। চার্চিল ধিংরার এই ঘোষণাপত্রকে দেশপ্রেমের অসাধারণ দলিল বলে অ্যাখ্যা দেন।

ঘোষণা পত্রে ধিংরা লিখেছিলেন—

"আমি ঘোষণা করছি আমি একজন ইংরাজ রাজপুরুষের রক্তপাত করতে বদ্ধ পরিকর ছিলাম।

এইসঙ্গে আমি একটা কথা বলতে চাই সেটি হচ্ছে এই যে মাতৃভূমিকে ভালবাসার জন্য বৃটিশ সরকার ভারতীয় তরুণদের যে ভাবে ফাঁসী ও দ্বীপান্তর দিচ্ছেন এটি তার প্রতিবাদ মাত্র।

আমি এই কাজ কারও নির্দেশ বা প্রেরণায় করিনি। একমাত্র আমার বিবেকের কাছে আমি পেয়েছি এই প্রেরণা এবং আমার কি করা উচিত তা অনুভব করছি। আমি বেশ বুঝতে পেরেছি যে আমার মাতৃভূমিকে শাসন করছে ইংরেজ বল প্রয়োগ দ্বারা। এই সামরিক শক্তিতে বলীয়ান ও সঙ্গতি-শালী রাজশক্তির সাথে লড়াই করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আমি পিস্তলের মুখে এই রাজশক্তির অনাচারের জবাব দিলাম।

আমি হিন্দু, আমি বিশ্বাস করি মাতৃভূমির অসম্মান স্রষ্টার অসম্মান। আমি অসহায় এবং সঙ্গতি-হীন ভারত সন্তান আমি আত্মদান ছাড়া মাতৃভূমির জন্য কি করতে পারি? সেইজন্য জননী জন্মভূমির পূজাবেদীতে আমার জীবন অর্ঘ্য স্বরূপ দিতে চাই।

দ্বিধাহীন চিত্তে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমি আত্মোৎসর্গ করছি। এই হত্যা ও আত্মোৎসর্গ আমাদের লড়াই—এই লড়াই আমাদের চলবে যতদিন ভারতে থাকবে বৃটিশ শাসন।

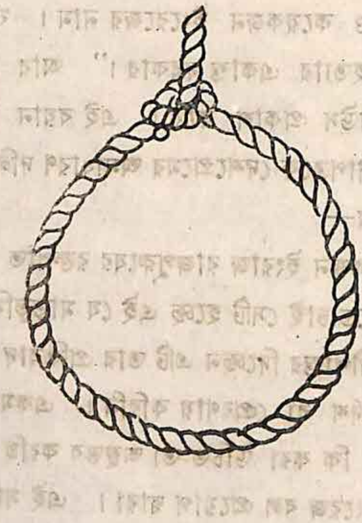
ভগবানের নিকট আমার প্রার্থনা—আমার জন্ম শীঘ্রই যেন ভারতেই হয় এবং মাতৃভূমির মুক্তির জন্ম বার বার আত্মোৎসর্গ করতে পারি যতদিন ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান না হয়।"

—মদনলাল ধিংরা

৩রা জুলাই লণ্ডনের কোর্টে বিচারকের প্রশ্নে মদনলাল বলেন, "আমার যা কিছু বলার তা আমার লিখিত বয়ানে বলেছি। পুলিশ তা হস্তগত করেছে।" বিচারকের আদেশে বয়ানটি পুলিশ কোর্টে দাখিল করে।

অবশেষে বিচারে তাঁর ফাঁসির আদেশ হয়। মাত্র বাইশ বছর বয়সে ১৭ই আগস্ট ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনের পেন্টন বিলা জেলে ধিংরার ফাঁসী হয়।

ফাঁসীর দণ্ডাজ্ঞা পেয়ে ধিংরা হাসিমুখে বলেছিলেন এই দণ্ডের জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমার গর্ব, আমার জীবন আমার মাতৃভূমির জন্য বলি প্রদত্ত হল। ধন্যবাদ!



# চাপেকার ভাতৃত্রয় ও রানাডে

২২শে জুন ১৮৯৭।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক জুবলি উৎসব।

রাত্রি সাড়ে এগারটায় পর পর দু'খানি গাড়ি লাটভবনের গেট দিয়ে বার হয়। একখানায় প্লেগ কমিশনার র‍্যাণ্ডে আর একখানায় পত্নিসই সামরিক কর্মচারী লেঃ আর্নেষ্ট। অন্ধকার মধ্যরাত্রি। সহসা মৃদু আওয়াজ।

সংকেত ধ্বনি করেন বালকৃষ্ণ চাপেকার।

বালকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দামোদর চাপেকার র‍্যাণ্ডের গাড়ির পেছনে উঠে র‍্যাণ্ডের পিঠে ছুঁড়লে গুলি। আহত হলেন র‍্যাণ্ড। বিনায়ক রানাডের গুলিতে নিহত হলেন সামরিক কর্মচারী লেফ্‌টন্যান্ট আর্নেষ্ট।

৩রা জুলাই ( ১৮৯৭ ) এ হাসপাতালে র‍্যাণ্ডের হল জীবনাবসান এবং প্লেগ মহামারীর সুযোগে পুনার মানুষদের উপর যে ঘৃণ্য নৃশংস অত্যাচার সংঘটিত হচ্ছিল এর উপর পড়ল যবনিকা।

* * * *

দেড়মাস পরে দামোদর ধৃত হল এবং বিচারের প্রহসনে ফাঁসির হুকুম হয়।

১৮ই এপ্রিল, ১৮৯৮। হাসিমুখে ফাঁসির রজ্জু স্পর্শ করলেন দামোদর চাপেকার।

পুনার চাপেকার শ্রেণীর নিষ্ঠাবান ভক্ত ব্রাহ্মণ হরিপন্থ। এঁরই প্রথম পুত্র শহীদ দামোদর।

দ্বিতীয় পুত্র বালকৃষ্ণ। পুলিশ তাঁকে খোঁজ করে। হায়দরাবাদে পলাতক অবস্থায় থাকাকালীন দুই 'দ্রাবিড়' ভাই-এর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে বালকৃষ্ণ পুলিশের হাতে বন্দী হলেন। ইতিমধ্যে আসামীর কাঠগোড়ায় এসেছেন বিনায়ক রানাডে। বিচার চলে……

* * * *

৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৯। হরিপন্থের তৃতীয় বা সর্বকনিষ্ঠ পুত্র বাসুদেব রাত্রিকালে ছদ্মবেশে দ্রাবিড় ভাইদের বৈঠকখানায় গিয়ে হাজির হন।

কি চাই ?

"বড় রাস্তায় পুলিশ সাহেব গাড়িতে আছেন তোমাদের দেখা করতে বললেন।"

খবর দিয়ে বাইরে চলে গেলেন বাসুদেব। দ্রাবিড় ভাইদের বাড়ীর বাইরে এসে তিনি আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকেন। দুই ভাই দ্রাবিড় সেখানে আসতেই বাসুদেবের হাতের পিস্তল গর্জে উঠল। এক ভাইয়ের প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল আর একভাই হাতজোড় করে বলল—একি? উত্তর হল বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার।

আবার গর্জে উঠল কিশোর বাসুদেবের হাতের অগ্নি মালিকা, লক্ষ্য অব্যর্থ।

* * * *

পুলিশ বাসুদেবকেই সন্দেহ করল। থানাই বাসুদেবের জেরা হচ্ছে······

এমন সময় একদিন······

সেদিন ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৯।

বাসুদেব রিভলবার বার করে পুলিশ সাহেবের দিকে লক্ষ্য করেন। সাহেবের ধাক্কায় কিশোরের হাতের রিভলবার পড়ে যায়। বন্দী হলেন বাসুদেব।

* * * *

বিচার চলে। বিচারের নামে প্রহসন।

৮ই মার্চ, ১৮৯৯। শহীদ দামোদরের ভ্রাতা বালকৃষ্ণের হল ফাঁসির হুকুম। বালকৃষ্ণ নরহত্যা করেননি। তবু তাঁরও ফাঁসির হুকুম হয়।

অপরাধ, নরহত্যার নাকি সহায়তা। অতএব দণ্ড মৃত্যু।

ফাঁসির হুকুম পেলেন রানাডে। ফাঁসির হুকুম পেলেন বাসুদেব।

বাসুদেবের ফাঁসি হল আগে—৮ মে ১৮৯৯। ১০মে, ১৮৯৯ ফাঁসির মঞ্চে উঠলেন বিনায়ক রানাডে। ১১মে, ১৮৯৯ মধ্যম চাপেকার বালকৃষ্ণের শেষ দিন।

চাপেকার ভাতৃত্রয় আর বিনায়ক রানাডের তাজা রক্ত লিখে দিল অত্যাচারীর আর বিশ্বাস-ঘাতকের পরোয়ানা—মৃত্যু দণ্ড।

হরিপন্থ চপেকারের গৃহ শূন্য। তবুও হরিপন্থ পত্নীর চক্ষু অশ্রুহীন। ভগিনী নিবেদিতা তাকে সান্তনা দিতে এলে, তিনি বলেন—আমার কোন দুঃখ নেই। আমি তিন শহীদের জননী। এতো আমার গৌরব।

# বিদ্রোহী বিশ্বনাথ

বাংলাদেশের ছেলে-মেয়ের কাছে যিনি 'বিশে ডাকাত' নামে পরিচিত—আসলে তিনি ছিলেন একজন বিদ্রোহী কৃষকনেতা, গরীব মানুষদের বন্ধু, আর ধনী লোকের যম। ইংরেজ পুলিশ আর সৈন্য-বাহিনীও তাঁকে ভয় করত। ঐ ইংরেজরাই তাঁকে প্রচার করেছে বিশে ডাকাত বলে, আর ইংরেজদের দেখা-দেখি আমাদের দেশের মানুষেরাও অনেকে বলেছে ডাকাত। কিন্তু এখন নতুন করে ইতিহাস লেখা হচ্ছে। সে ইতিহাসে তিনি 'ডাকাত' নন, বীর বিদ্রোহী। আমরা এখানে তাঁর কথা বলব।

তাঁর পুরো নাম ছিল বিশ্বনাথ সর্দার। জাতিতে তিনি ছিলেন বাগ্দী। নদীয়া জেলার গাড়রা ভাতছালা গ্রামে তাঁর বাড়ি ছিল। এই গ্রাম চাপড়া থানার আট মাইল পূর্বে। সেকালে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় দুশ বছর আগে বাগ্দীরা ছিলেন সাহসী লাঠিয়াল। লাঠি ঘুরিয়ে তাঁরা বন্দুকের গুলিও ফিরিয়ে দিতে পারতেন। বর্শা বা সড়কী চালাতেও তাঁরা ওস্তাদ ছিলেন। এমনিতে চাষবাষ ছিল তাঁদের পেশা। এই বাগ্দীঘরেই বিশ্বনাথ জন্মেছিলেন। ততদিন বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় ইংরাজ রাজত্ব পাকাপোক্ত হয়েছে। কর্নওয়ালিস-সাহেব কৃষকের হাত থেকে জমি জমা কেড়ে নিয়ে পাকাপাকি-ভাবে জমিদারদের দিয়ে দিয়েছেন। গ্রামে গ্রামে লালমুখো সাহেব নীলকরেরা নীলকুঠী তৈরী করে চাষীদের উপর খুব জুলুম শুরু করেছে।

বিশ্বনাথদের পরিবারের উপরেও খুব অত্যাচার হয়েছিল। একদিকে দেশী জমিদারের অত্যাচার, অন্যদিকে বিদেশী নীলকরের অত্যাচার। অত্যাচারের ফলে বিশ্বনাথ বাড়িঘর জমিজমা সব হারিয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন, এর শোধ নেবেন। তিনিও পাল্টা আঘাত হানবেন জমিদারের উপর, নীলকরদের উপর।

যেমন প্রতিজ্ঞা তেমন কাজ। বিশ্বনাথ দল গড়তে লাগলেন গরীব মানুষদের নিয়ে। তাঁরই মত যে-সব মানুষ জমিদারের অত্যাচারে জমিজমা বাড়িঘর সব হারিয়েছে কিংবা নীলকরদের হাতে মার খেয়ে রক্তাক্ত হয়েছে—সেইসব মানুষেরা তাঁর দলে যোগ দিতে লাগলেন। দেখতে দেখতে নদীয়া আর যশোহরের অনেক মানুষ তাঁর দলে চলে এলেন। বিশ্বনাথ হলেন তাঁদের সর্দার অর্থাৎ নেতা।

নদীয়া-কাহিনী নামে পুরনো একটা বই থেকে দেখা যায়, বিশ্বনাথের দলে একহাজারেরও বেশী গরীব চাষী মজুর যোগ দিয়াছিলেন।

এঁরাই ছিলেন বিশ্বনাথের সৈনবাহিনী। বিশ্বনাথ তাঁদের নানারকম দেশী অস্ত্রে সজ্জিত

করেছিলেন। লাঠি বর্শা বল্লম তরবারী এসব ছিল তাঁদের অস্ত্র। আড়াআড়ি ভাবে কাঁসার থালা ও কাঁচা বেল ছুঁড়েও তারা শত্রুকে ঘায়েল করতেন। তাঁরা বিশ্বনাথের হুকুম মেনে চলতেন শিক্ষিত সৈন্যদের মতই।

বিশ্বনাথ ছিলেন কালো, শক্ত সুন্দর গঠনের মানুষ। তাঁর মন ছিল উদার—গরীবের প্রতি দয়া মায়ায় ভরা। তিনি তাঁর দল-বল নিয়ে বীরের মত গ্রাম কাঁপিয়ে মাটি দাপিয়ে চলাফেরা করতেন। অত্যাচারী জমিদারদের তিনি আগের থেকেই খবর পাঠিয়ে দিয়ে বলতেন—আমরা যাচ্ছি যদি বাঁচতে চাও ত টাকা পয়সা সোনা দানা ভালয় ভালয় বের করে দাও। নইলে মাথা কাটা যাবে। খবর পাঠিয়ে বিশ্বনাথ যেতেন পাল্কি চেপে, সঙ্গে বাহিনী। জমিদারবাড়ি ঘিরে ফেলতেন তাঁরা। এতদিন ধরে গাঁয়ের গরীব মানুষদের রক্ত শুষে যত সম্পত্তি করেছে—বিশ্বনাথ সব লুঠ করে নিয়ে আসতেন। জমিদারেরা বাধা দিলে লড়াই করতেন, বাধা না দিলে কখনও কাউকে তিনি প্রাণে মারতেন না।

দলের লোকের উপর বিশ্বনাথের কড়া হুকুম ছিল—কেউ যেন মেয়েদের গায়ে হাত না দেয়, গরীব মানুষদের অত্যাচার না করে। শিশু এবং গোজাতি অর্থাৎ গরুর উপর আঘাত না করে। তাঁর দলের লোকেরা হিন্দু মুসলমান উভয়েই তাঁর আদেশ মেনে চলত। ধনীর বাড়ি লুঠ করে বিশ্বনাথ দরিদ্রদের দান করতেন। নিজে কখনও সে-ধন ভোগ করতেন না।

জমিদারদের পরেই বিশ্বনাথের রাগ ছিল নীলকুঠির উপর। নদীয়া ও তার পাশের জেলা যশোহরে তখন অনেক নীলকুঠি ছিল। নীলকর সাহেবরা চাষীকে ধরে জোর করে নীল বোনাত। নীল না বোনলে চাষীর ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দিত। মেয়েরা শিশুরা পুড়ে মরত।

এসব অত্যাচারের শোধ নেবার জন্য বিশ্বনাথ তাঁর দলবল নিয়ে একটার পর একটা নীলকুঠি আক্রমণ করতে লাগলেন। নীলকুঠির ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিতে লাগলেন, টাকা পয়সা লুঠ করলেন। নীলকরেরা প্রাণের ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালাতে লাগলেন। একবারের ঘটনা বলছি শোন।

১৮০৮ সাল-সেপ্টেম্বর মাসের এক গভীর রাত্রি। নদীয়ার এক অত্যাচারী নীলকর ফ্যাডীসাহেবের বাংলো আক্রমণ করলেন বিশ্বনাথ। এই ফ্যাডী ছিল এক নম্বরের শয়তান। তার অত্যাচারে কত চাষীর ঘর বাড়ি পুড়েছে, প্রাণ নষ্ট হয়েছে তার হিসাব নেই। বিশ্বনাথ তাঁর দলবল নিয়ে ফ্যাডীকে বন্দী করে ফেললেন। ফ্যাডীর বউ প্রাণের ভয়ে দৌড়ে পুকুরে ঝাঁপ দিল—তার পর একটা কালো হাঁড়ি মাথায় দিয়ে সারারাত শীতের মধ্যে পুকুরের জলে ডুবে থাকল। এদিকে বিশ্বনাথ সর্দারকে সামনে দেখে ফ্যাডী সাহেব থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে পায়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়ল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমাকে প্রাণ মেরোনা, প্রাণ ভিক্ষা দাও।

বিশ্বনাথের দলের লোকেরা যাদের অনেকের উপরেই ফ্যাডী একদিন অত্যাচার করেছে, তারা গর্জে উঠে বলল, না, ক্ষমা নেই? তোমাকে খুন করে এবার আমরা শোধ নেব। বলে তারা ফ্যাডীকে কেটে ফেলার জন্য তরবারি তুলল। কিন্তু বিশ্বনাথ ছিলেন প্রকৃত বীর। সাহেব কাঁদতে কাঁদতে প্রাণভিক্ষা চাইছে বলে তার দয়া হল। তিনি সঙ্গীদের নিষেধ করলেন ফ্যাডীকে মারতে। আর ফ্যাডীকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা

করিয়ে নিলেন—প্রাণে বেঁচে গেলে আর কারো উপর কোনদিন অত্যাচার করবে না। কাউকে দিয়ে জোর করে নীলও বোনাবে না। ফ্যাডী সাহেবের তখন ধড়ে প্রাণ এল। সে বাইবেল আর যীশুখ্রীষ্টের নাম করে প্রতিজ্ঞা করল। বিশ্বনাথ তাকে ছেড়ে দিলেন।

কিন্তু আগেই বলেছি ফ্যাডী ছিল আস্ত শয়তান। ছাড়া পাওয়ার কয়েকদিন পর সে অন্যান্য নীলকরদের নিয়ে ঘোঁট পাকাতে লাগল। অত্যাচারী জমিদাররাও যোগ দিল ফ্যাডীদের সঙ্গে। বিশ্বনাথ সর্দার সকলের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন। বিশ্বনাথকে জব্দ না করতে পারলে মুশকিল। নীলের চাষ বন্ধ হয়ে যায়—চাষীর উপর অত্যাচার করে জমিদারদের ধান চাল পয়সা কড়ি জমান বন্ধ হয়। কাজেই সব অত্যাচারী একসঙ্গে জোট বাঁধল। তারা ইংরেজ সরকারকে বলল, সৈন্য পাঠিয়ে বিশ্বনাথকে জব্দ করুন, নইলে ধন-মান সব যাই।

ইংরেজ সরকার তো তাদেরই সরকার। তাদের সার্থ দেখাই তো তার কাজ। নীলকর আর জমিদারদের কথা মত সরকার বাহাদুর ব্ল্যাকুয়ার নামে একজন ইংরেজ সেনাপতির অধীনে একদল গোরা সৈন্য পাঠিয়ে দিল। কলকাতা থেকে তারা নদীয়ায় এল।

তখন নদীয়ার জেলা শাসক ছিলেন ইলিয়ট সাহেব। তিনিও তাঁর পুলিশবাহিনী নিয়ে ব্ল্যাকুয়ারের সঙ্গে যোগ দিলেন। নীলকর ও জমিদারের ভাড়াটে লাঠিয়ালরাও তাদের সঙ্গে যোগ দিল। কাজে কাজেই বিশ্বনাথ ধরা পড়লেন, তাঁর তো এত শক্তি ছিল না! বন্দুকও ছিল না। ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি কি করে আর জিতবেন।

বিশ্বনাথ ধরা পড়লে নীলকর আর জমিদারদের খুব আনন্দ হল। কিন্তু নদীয়া-যশোহরের গরীব মানুষেরা চোখের জল ফেলল। বিশ্বনাথ তো তাদের দরদী বন্ধু ছিলেন।

বিশ্বনাথকে ধরে ইংরেজরা জেল হাজতে রাখল না। বিচারের ভান করে সরাসরি তাঁকে ফাঁসি দিয়ে দিল। বিশ্বনাথের সঙ্গে আরো বারোজন কৃষক বীরের ফাঁসি হল। নদীয়ার ঠগবগের খালের ধারে বাঁশবেড়িয়া নীলকুঠির দক্ষিণে নদীর ধারে একটি বটগাছে ঝুলিয়ে তাদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল।

এই বিশ্বনাথ সর্দার-এর কথা মনে পড়লে এখনও শ্রদ্ধায় আমাদের মাথা নত হয়।



# সাঁওতাল নেতা সিধু

বৃটিশ-শাসন যত দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হল তত বেড়ে চলল শোষণ। বসল শহর, আদালত, হাসপাতাল, রেল, তার, ডাক।

সাঁওতাল পরগণার পাশ দিয়ে চলল রেল। দুর্ভেদ্য সাঁওতাল পরগণার পাহাড় ও জঙ্গলের ভিতর লুব্ধ বণিকরাজ ইংরেজের দালাল দেশী জমিদার, মহাজন, বেণিয়ার শোষণ আরম্ভ হল। সাঁওতাল বন্য জাতি। সভ্যতার বর্বর লোভ তাদের কাছে অসহনীয়। স্বাধীনচেতা এই সাঁওতালরা দাসত্বের প্রতিবাদ করে। নির্যাতীত হয়ে বিদ্রোহ করে।

কলকাতার সন্নিকটে নারায়ণপুরের জমিদার ইংরেজের দালাল। শোষণ লোভে সাঁওতাল পরগণায় সে ব্যবসা পাতল।

অকথ্য নির্যাতনের সম্মুখীন হ'ল সাঁওতাল জাতি। নির্যাতন যখন হয়ে উঠল সীমাহীন তখন দলে দলে সাঁওতাল তীর ধনুক নিয়ে কলকাতার দিকে অগ্রসর হয়।

নারায়ণপুরের জমিদার বাড়ি আক্রান্ত হ'ল। জমিদার নিহত হয়, দালালদের রক্ষার জন্য ছুটল ইংরাজ সৈন্য। সাঁওতালদের সঙ্গে ইংরাজ সৈন্যের বাঁধল সংঘর্ষ। ইংরাজের কামানের গোলার সামনে তীর, ধনুক, হাতে যুদ্ধ করল সাঁওতালেরা। ইংরেজদের সহিত যুদ্ধে সাঁওতালরা প্রাণ দিল।

পাহাড়ের ছায়ায় শাল আর মহুয়ার বনানী ঘেরা শস্য শ্যামল প্রকৃতির কোলে সাঁওতালরা মানুষ। স্বভাবতঃ তাই সরল ও স্বাধীনচেতা। তাদের সহজ, স্বচ্ছন্দ জীবন-যাত্রার মাঝখানে অমা-রাত্রির অন্ধকারের বিভীষিকার মত আবির্ভাব হল ইংরেজ শাসন—শাসনের নামে শোষণ।...শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের বনজঙ্গল কেটে জঙ্গলী জায়গাকে সম্পদশালিনী করেছিল সাঁওতালরা। কিন্তু শাসনের নামে তাদের আয়ে

ভাগ বসাতে লাগল সরকারী আমলারা। বিপর্যস্ত সাঁওতালরা নিপীড়নে নির্যাতন হয়ে উঠল বেপরোয়া। বন্য সাঁওতালরা হল সংগ্রামী।

সাঁওতাল পরগণার রাজধানী বারহাইট-এর উপকণ্ঠে ভাগনাদিহি গ্রাম। সাঁওতালদের নেতা সিধু ও কানু দুই ভাই এই গ্রামে বাস করত। সিধু ও কানুর বিশ্বস্ত অনুচর ছিল চাঁদ ও ভৈরব নামক অপর দুই ভ্রাতা। সিধুর প্রাণে বাজল সরকারের অন্যায় নিপীড়ন। তাই ও বিশ্বস্ত অনুচরদের নিয়ে সাঁওতালদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে লাগল। আসন্ন বিদ্রোহ সম্বন্ধে সমগ্র সাঁওতাল সম্প্রদায়কে সজাগ করে তুলল সে।

ইংরেজদের কুঠি ও রেল লাইনের উপর সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ করাই হ'ল তাদের পরিকল্পনা।

সাঁওতালদের অস্ত্র ছিল তীর ধনুক, কুঠার, তলোয়ার আর সামান্য কয়েকটা বন্দুক। সিধু, কানু ও চাঁদ, ভৈরবের প্রাণান্ত পরিশ্রমে সাঁওতালরা হল সঙ্ঘবদ্ধ ও সশস্ত্র। এমন সময় গ্রামে গ্রামে সাঁওতালদের কাছে এল আসন্ন বিদ্রোহের নেতা সিধুর বার্তা ঃ

তোমাদের কাছে এই এক টুকরো কাগজ যাচ্ছে ঃ

ভগবান আমাকে স্বপ্ন দিয়েছেন আর এরকম বহুৎ কাগজ পাঠিয়েছেন। মনে রেখো, ভাই……… এ কাগজ ভগবানের আশীর্বাদ। ভয় নেই? নির্ভয় হও। আমাদের পিছনে আছেন ভগবান। ফিরিঙ্গি আমরা তাড়াবই।

শাল গাছের ডাল গেলেই ঘর-পিছু একজন করে আমার বাড়িতে হাজির হবে। ভুলো না।

ইংরাজী ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে জুন সিধুর বাড়িতে বসল সভা। পূর্বাহ্ণে সাঁওতালদের ঘরে ঘরে গেল শাল গাছের ডাল। সিধুর বাড়িতে এসে জোড়ো হ'ল দলে দলে সাঁওতাল। দশ হাজার সাঁওতালের জমায়েত নিল মরণপণ সংগ্রামের দুর্জয় সঙ্কল্প।

……মাত্র এক সপ্তাহ। এক সপ্তাহ পরই সাঁওতালদের নিঝুম দেশ ভরে জ্বলে উঠল আগুন। ৭ই জুলাই থানার দারোগা একদল পুলিশ নিয়ে এল ভাগনাদিহি গ্রামে—সেদিনকার জমায়েত সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেবার জন্য।

সাঁওতালদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ বাঁধল। সিধুর হাতে দারোগা নিহত হ'ল। ন'জন পুলিশ সাঁওতালদের হাতে প্রাণ দিল। অন্যান্য পুলিশেরা পালিয়ে গেল।

বিদ্রোহ শুরু হল……………………

রানীগঞ্জে মোতায়েন হল সরকারী সৈন্য। ১৩ই জুলাই তারিখে সরকারী সৈন্যদের সাথে সাঁওতালদের প্রবল সংঘর্ষ হ'ল। সাঁওতালরা জয়ী হল।

অনবরত চলে সাঁওতাল আর সরকারী সৈন্যদের মধ্যে সংঘর্ষ।

এদিকে বন্দুক, রাইফেল, গুলিগোলা, বারুদ··অপরদিকে তীর ধনুক, কুঠার, তলোয়ার। পৃথিবীর অন্যতম পরাক্রান্ত সামরিক শক্তি একদিকে, আর অপর দিকে চির অবহেলিত নিঃস্ব দুঃস্থ ভারতের আদিম অধিবাসী জাতি। সাঁওতালদের দুর্দিন এল। ডাক, তার রেলের জন্য সরকারী সৈন্যদের মধ্যে বেশ

যোগাযোগ ছিল। আর যোগাযোগের অভাবে সাঁওতালরা হয়ে পড়ল বিচ্ছিন্ন। এবার শুরু হয় পরাজয়ের পালা।

* * * *

পরাজয়ের পর পরাজয়ে তারা বনজঙ্গলে আশ্রয় নিল।…সভ্যতা-গর্বী জাতি যখন বর্বরতার আশ্রয় নেয় তখন সে বর্বরতা হয় ভয়াবহ। নভেম্বরে সাঁওতালদের সমস্ত এলাকায় সামরিক আইন জারি হল।

সাঁওতালদের অধ্যুষিত অঞ্চল হ'ল আইন বহির্ভূত অঞ্চল।

এর বেশিরভাগ জায়গা ছিল আগে বাংলার অন্তর্গত। এরপর ইহা বিহার প্রদেশের ভাগলপুর বিভাগের হয়।

বাঙালী ও সাওঁতালের বসবাসই এখানে বেশী। বাংলার রাঢ় অঞ্চলের এখনও অনেক সাঁওতালের বাস। অধিকাংশ সাঁওতাল বাংলা ভাষা-ভাষী। ফলে সাঁওতালদের আমরা সচ্ছন্দে বাংলার লোক বলতে পারি।

সামরিক আইনের কবলে পড়ল সাঁওতাল জাতি। বিনা আইনে বে-আইনীভাবে সাঁওতালদের উপর শুরু হল দমন নীতি। একদিকে নির্মম অত্যাচার অপরদিকে অর্থের প্রলোভন।

নিপীড়নে দিশেহারা বহু সাঁওতাল আত্মসমর্পণ করল। বিশ্বাসঘাতকের চক্রান্তে ভাগলপুরের সরকারি সৈন্যের হাতে ধরা পড়ল সিধু।

শেষে বৃটিশের কারাগারে সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা সিধু বন্দী হল। আরো দশ হাজার অনুচর কারা-প্রাচীরের অন্তরালে ফাঁসির দিন গুণতে লাগল।

বাইরে তখনও স্থানে স্থানে চললো খণ্ড যুদ্ধ। ফাঁসির রজ্জুর বিভীষিকা নামে সাঁওতালদের চোখের উপর। কামানের ধোঁয়ায় থেমে যায় হৃদপিণ্ডের স্পন্দন।

১৮৫৬ সালে শীতের শেষাশেষি বিদ্রোহের ডঙ্কা থেমে যায় সর্বত্র।

হিমশীতল প্রাণে-প্রাণে কায়েম হল পরাধীনতা? শাল-অর্জুনের ডালে ডালে ফাঁসির দড়িতে দোদুল্যমান দশহাজার বিদ্রোহী সাঁওতাল আর তাদের নেতা সিধুর শব কাঁপে বসন্তের প্রথম হাওয়ায়।

মহুয়ার বনের ছাওয়ায় আচমকা থেমে যায় মাদল আর উত্তাল নাচের তাল।

# মঙ্গল পাণ্ডে

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ, ভারতবর্ষের আকাশে বাতাসে ধূমায়িত অধিকারচ্যুত রাজা জমিদারদের ক্রোধ আর নির্যাতিত প্রজাদের আর্তনাদ। এর সঙ্গে মিশল দেশীয় সেপাইদের অসন্তোষ।

দেশীয় সেপাইদের বেতন কম কিন্তু গোরা সৈন্যদের বেতন বেশী। বড় বড় পদ গোরা সৈন্যের। দেশীয় সেপাইদের কৃতিত্ব যতই হোকনা কেন তাদের চলতে হত গোরা সেপাইদের হুকুম মত। দেশী সেপাইদের মান গেল।

সেপাইরা বেশীরভাগ অযোধ্যার লোক। বিশ্বাসঘাতকতা করে ইংরাজ দখল করল অযোধ্যা। সেপাইরা ইংরাজদের উপর বিশ্বাস হারাল। দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে শুরু হয়েছিল খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচার। এরকম কানাঘুষোও চলতে লাগল যে এনফিণ্ড রাইফেলে ব্যবহারের জন্য যে কার্তুজ দাঁত নিয়ে কেটে সেপাইদের ব্যবহার করতে হয় তাতে গরু ও শুয়োরের চর্বি মাখানো আছে। হিন্দু মুসলমান দুই শ্রেণীর সেপাইরা মনে করল তাদের জাত গেল।

ঠিক সেই সময় চট্টগ্রাম সীমান্ত রক্ষায় ছিল ৩২নং রেজিমেন্ট। এই রেজিমেন্টের সিপাহী রামধারী গোলা-বারুদের কারখানায় কাজ করত। সে বারাকপুরের ৪৭নং রেজিমেণ্টে স্থির নিশ্চিন্ত হয়ে সংবাদ দেয় রাইফেলের কার্তুজে চর্বি মেশানো হয় এবং তা গরু এবং শুয়োরের। শুরু হয় ষড়যন্ত্র। সিপাহীরা রুটির মধ্যে সংবাদ গুঁজে গোপনে এক রেজিমেন্ট থেকে আর এক রেজিমেণ্টে পাঠাতে থাকে। নির্দিষ্ট দিনে একই সাথে বারাকপুর' মীরাট, লক্ষ্ণৌ, ঝাঁসীতে বিদ্রোহ শুরু হয়।

ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডে সার্জেন্ট মেজর হগসনকে গুলি করে হত্যা করে। হগসন তার কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত করে। লঘু অপরাধে হগসন ঐদিনই মঙ্গল পাণ্ডেকে সৈনিকের পোশাক খুলে ফেলতে বলে, কারণ 'সেদিন সন্দেহভাজন ব্যক্তি' একজন সৈনিকের পক্ষে এ চরম অপমান। তাই পাণ্ডে এই অপমান গায়ে না মেখে হগসনকে গুলি করে।

কর্নেল হুইলার মঙ্গল পাণ্ডেকে গ্রেপ্তার করার আদেশ দেয়। কিন্তু কোন দেশীয় সৈনিক এই কাজে এগিয়ে আসে না। তখন হুইলার ও হিয়রাসে একযোগে মঙ্গল পাণ্ডেকে আক্রমণ করে এবং এই সময় এক বিশ্বাসঘাতকের সহায়তায় তাকে বন্দী করে।

চট্টগ্রামের বিদ্রোহী সিপাহীরা জেলখানা খুলে দিল। লুট করল রাজকোষ। ব্যারাকপুরের সমস্ত দেশীয় সৈন্য বিদ্রোহ করল। এই বিদ্রোহকে দমন করার জন্য, আতংক ছড়ানোর জন্য বিনা বিচারে

ইংরাজ বীরপুঙ্গবরা ব্যারাকপুরের ধৃত মঙ্গল পাণ্ডেকে তৎক্ষণাৎ রাজপথে প্রকাশ্যে গাছের ডালে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়। তারিখটা ছিল ২৯.৩.১৮৫৭।

পাণ্ডে প্রথম বিদ্রোহের গুলি ছোঁড়েন বলে ইংরেজেরা তৎকালীন বিদ্রোহীদের বলত পাণ্ডিয়া।

যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে ছিলেন মঙ্গল পাণ্ডে তা কিন্তু সহজে নেভেনি। একবছর ধরে সমস্ত ভারতবর্ষ তার দাবানলে ছারখার হয়েছে। ইংরেজ কখনও ভীত শৃগালের মত গর্তে লুকিয়েছে। কখনও বা নেকড়ে আর ক্রুর সাপের মত নিরীহ ভারতবাসীদের নির্বিচারে হত্যা করে আতংক সৃষ্টি করেছে। তাঁতিয়া টোপীর ফাঁসি দিয়েছে। এই স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছেন। তবুও স্বাধীনতার জন্য ভারতবাসীকে আরও প্রায় একশ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে।



# বাঁশের কেল্লায় ফাঁসি

তিতুমীরের আসল নাম ছিল মীর নিসার আলি। নিসার আলি কি করে তিতুমীর হলেন—সে কাহিনী খুব মজার। ছোটবেলায় প্রায়ই নানারকম জ্বর-জ্বারিতে ভুগতেন তিনি। তখন ঔষধপত্র কিছুই পাওয়া যেত না। তাঁর আত্মীয়রা নানারকম গাছগাছালির পাতা বেটে তেতো রস খাওয়াতেন তাঁকে। নিসার আলি একটুও আপত্তি করতেন না। যেন মিষ্টি মধু খাচ্ছেন—এমন হাসিহাসি মুখ করে সেই বিষ-তেতো রস খেয়ে ফেলতেন। সেই থেকে সবাই তাকে বলতে লাগল 'তিতা মিঞ্চা'। এর থেকে পরবর্তী কালে তিনি হয়ে গেলেন তিতুমীর। এখন নিসার আলি বলে তাঁকে আর কেউ চেনে না। সবই জানে বাঁশের কেল্লার বীর বিদ্রোহী অমর শহীদ তিতুমীর।

১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ পরগনার চাঁদপুর গ্রামে তিতুমীরের জন্ম। সেকালের নিয়ম মতো তিনি আরবী ও ফারসী ভাষায় শিক্ষালাভ করেন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে যান মক্কায়। সেখানে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় সৈয়দ আহ্‌মদ নামে এক নেতার সঙ্গে। ইনি ছিলেন ভারতের ওয়াহাবি আন্দোলনের নেতা।

ওয়াহাবি আন্দোলন হ'ল মুসলমানদের ধর্ম সংস্কারের আন্দোলন। আরব দেশে আবদুল ওয়াহাব নামে এক ব্যক্তি এই আন্দোলন শুরু করেন। কিন্তু ভারতে এই আন্দোলন শুধু ধর্ম সংস্কারের মধ্যে অবদ্ধ ছিল না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে যেসব ইংরেজ এই দেশ শাসন করত—ওয়াহাবি আন্দোলন সেই ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়ে ওঠে। ওয়াহাবিরা বলেন, ইংরেজদের শাসন বেআইনী, এদেশে থাকার তাদের অধিকার নেই, তাদের কেউ যেন রাজা বলে না মানে, কেউ খাজনা না দেয়।

এইভাবে ওয়াহাবিদের সঙ্গে ইংরাজদের বিবাদ বাধে। ইংরাজরা চায় এদেশ লুটেপুটে শ্মশান বানাতে, ওয়াহাবিরা চায় ইংরেজদের তাড়িয়ে মুসলমান রাজত্ব স্থাপন করতে। কাজেই উভয় পক্ষেই এখানে ওখানে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

বাংলাদেশে তিতুমীর ছিলেন এই ওয়াহাবি আন্দোলনেরই একজন নেতা। একদিকে তিনি মুসলমানদের ডেকে বলেছিলেন খাঁটি মুসলমান হতে। অন্য দিকে ইংরেজদের বলেছিলেন ভারত ছাড়তে। তাঁর মন খুব উদার ছিল। তাঁর মধ্যে নিজের ধর্মের পবিত্রতা রক্ষার সংকল্প ছিল, কিন্তু অন্য ধর্মের প্রতি

কোন বিদ্বেষ ছিল না। গোড়ার দিকে তিনি শুধু ধর্ম-আন্দোলন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন—কিন্তু অল্প পরেই জমিদার মহাজন ও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তাঁকে অস্ত্র ধরতে হয়।

গ্রাম বাংলার উপবাসী দরিদ্র মানুষকে জড়ো করে তিতুমীর এক সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। গ্রামের তাঁতি, জোলা ইত্যাদি এবং অত্যাচারিত কৃষকেরা তাঁর বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। গোলাম মামুদ নামে এক ব্যক্তি তাঁর বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন। তখন একদিকে চলছে দেশীয় জমিদার ও মহাজনের অত্যাচার অন্যদিকে কোম্পানীর সাদা চামড়ার কর্মচারী ও নীলকরদের অত্যাচার। তাঁরা গ্রামের মানুষের ফসল লুঠ করছে, বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে। ধানের জমিতে জোর করে নীল বোনাচ্ছে, নীল না বুনলে গুলি করে মেরে ফেলছে। এই অবস্থাই গাঁয়ের গরিব মানুষ প্রতিকারের



বাঁশের কেল্লায় যুদ্ধ

আশায় তিতুমীরের বাহিনীতে যোগ দিতে লাগল। যারা দিল না তারাও নানাভাবে সাহায্য করতে লাগল। তিতুমীরের কৃষক বাহিনীতে শুধু মুসলমান নয় গরীব কৃষকেরাও যোগ দিতে লাগল। অত্যাচারীর যেমন কোন জাতি ধর্ম নেই, অত্যাচরিত মানুষদেরও তেমনি নেই। পৃথিবীতে জাত ধর্ম তো দুটোই— একটা শোষকের আর একটা শোষিতের। আর সবই তো বানিয়ে তোলা।

তিতুমীর তাঁর সৈন্যবাহিনী দিয়ে গ্রামে গ্রামে দরিদ্র মানুষকে ডেকে বলেন, তাঁরা জমিদারদের অন্যায় খাজনা যেন না দেয়, মহাজনদের সুদ না দেয়। নীল চাষীদের ডেকে বলেন, তারা যেন ধানের জমিতে নীল চাষ না করে। তিতুমীরের এই ডাকে অগণিত মানুষ সাড়া দেয়, তারা খাজনা দেওয়া ও নীল চাষ করা বন্ধ করে দেয়। এর ফলে বাঙালী জমিদার ও মহাজনরা এবং সাদা চামড়ার নীলকর— সবাই তিতুমীরের উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়। তারা দল বেঁধে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বড় কর্তাদের কাছে আবেদন করে। শীঘ্র তিতুকে জব্দ করুন। নাহলে খাজনা আদায়, নীলচাষ, ব্যবসা বাণিজ্য, মুনাফালোটা সব বন্ধ হয়ে যায়।

কেল্লার মধ্যে ছিল নানা ধরনের ঘর, কোন ঘরে খাদ্যদ্রব্য, কোন ঘরে পানীয় জল, কোনোটায়

তরবারি, বর্শা, বল্লম ইত্যাদি অস্ত্র, আবার কোনটায় হাজার হাজার কাঁচা বেল ও ইটের বা পাথরের টুকরো। তিতুমীরের বাহিনীর এইসব ছিল যুদ্ধের অস্ত্র।

একজন কর্নেলের অধীনে ইংরেজ বাহিনী বাঁশের কেল্লা ঘিরে ফেলে। তখন ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাস, শীতকাল। সকাল থেকেই যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। এক পক্ষে কামান বন্দুক, অন্য পক্ষে বর্শা, বল্লম, তীর-ধনুক। ইংরেজ বাহিনী বাঁশের কেল্লার কাছে পৌছতে পারল না। ঝাঁক বেঁধে বর্শা কিংবা কাঁচাবেল ছুটে এসে তাদের বিপর্যস্ত করে দিতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত কামান থেকে গোলা ছুঁড়তে শুরু করল তারা। বাঁশের কেল্লার উপর ঘন ঘন কামানের গোলা আছড়ে পড়তে লাগল। বাঁশের বেড়া ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে লাগল। কিন্তু তিতুমীর ভয় পেলেন না। শত্রুর কাছে মাথাও নত করলেন না। কামানের আগুনের গোলার মধ্যে দাঁড়িয়েই তিনি বীরের মতো যুদ্ধ করতে লাগলেন। কিন্তু হঠাৎ একটি গোলা এসে পড়ল তার শরীরে। তিতু আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। পৃথিবীর যে কোন বড় বীরের মতোই সম্মুখ যুদ্ধে হাসি মুখে প্রাণ দিলেন।

বাঁশের কেল্লা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ল। তিতুমীরের সৈন্যরা অনেকেই মারা পড়ল। তিতুমীরের সেনাপতি গোলাম মাসুম ধরা পড়লেন, তার সঙ্গে আরো ৩৫০ জন ধরা পড়ল। প্রাণের ভয়ে কেউ পালায় নি। যুদ্ধ করতে করতেই তারা ধরা পড়ল, তাদের হাতে তো কামান বন্দুক ছিল না।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরেজ সরকার গোলাম মাসুমকে ঐ নারিকেল বেড়িয়াতেই ফাঁসি দিলেন। অন্যদের পাঠান দ্বীপান্তরে কিংবা বহু বছরের জন্যে কয়েদ খানায়। তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হল। এমনি করে তিতুমীরের কৃষক বিদ্রোহকে গুলিগোলা কামান দিয়ে নিষ্ঠুর ভাবে দমন করল ইংরেজ সরকার। ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে এই যুদ্ধ হয়েছিল।

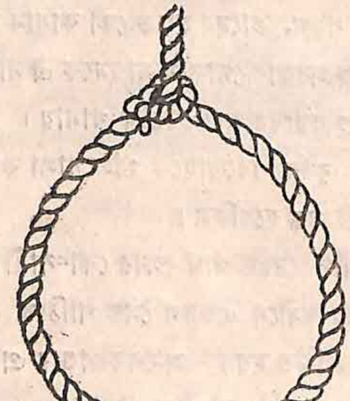
কোম্পানী তো জমিদার আর নীলকদেরই স্বার্থ রক্ষার কোম্পানী। সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা থেকে তারা আলেকজাণ্ডার নামে এক সেনাপতির অধীনে একদল সৈন্য পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু তিতুমীরের বাহিনীর কাছে ইংরেজ বাহিনী ভীষণ ভাবে পরাজিত হয়। আলেকজাণ্ডার প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যান। তার বহু সৈন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রেই মারা পড়ে। ১৮৩০ সালের নভেম্বরে এই যুদ্ধ হয়।

এর ফলে তিতুমীরের শক্তি সাহস আরো দ্বিগুণ বেড়ে যায়। তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে অত্যাচারী জমিদার ও নীল করদের শায়েস্তা করতে থাকেন। নদীয়া, ২৪-পরগনা এবং ফরিদপুরের কিছু অংশ তিতু-মীরের স্বাধীন রাজ্য হয়ে ওঠে। সম্রাটের মতই তিনি হুকুম জারি করে নীল চাষ বন্ধ করে দেন, জমিদারদের বলেন রাজকর দিতে এবং ঘোষণা জারি করেছেন ইংরেজদের রাজত্ব খতম হয়ে গিয়েছে! নীলকরেরা ভয়ে কলকাতায় পালিয়ে যেতে থাকে, অত্যাচারী জমিদারদের রাতের ঘুম ছুটে যায়, ভয়ে তাদের বুকের রক্ত শুকিয়ে ওঠে। অন্য দিকে তিতুমীরের দলে আরো দরিদ্র কৃষক দলে দলে যোগ দিতে থাকে। তার বাহিনী আরো জোরদার হয়ে ওঠে।

জমিদার ও নীল করেরা একত্র হয়ে তিতুমীর কে ধ্বংস করার শলা পরামর্শ করে। কলকাতায় এক জমিদার বাড়িতে জমিদারদের এক সভা হয়। জমিদার ও নীলকরেরা আবার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর

কাছে সৈন্য পাঠানর জন্য কাতর আবেদন করে। এবার কোম্পানী এক বিশাল সৈন্যদল পাঠিয়ে দেয়। এদের সঙ্গে ছিল শক্তিশালী কামান, বন্দুক, গোলন্দাজ সৈন্য, পদাতিক সৈন্য এবং অশ্বারোহী সৈন্য। এই বিশাল সৈন্যবাহিনী তিতুমীরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এদের সঙ্গে যোগ দেয় অত্যাচারী জমিদার ও নীলকরেরা।

বিদ্রোহী তিতুমীর আলেকজাণ্ডারকে পরাজিত করার পর থেকেই এই ধরনের বড় আক্রমণের আশঙ্কা করছিলেন। কামানসহ ইংরেজবাহিনী এগিয়ে আসছে শুনে তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনীকে নির্দেশ দেন একটি মজুবুত দুর্গ গড়ে তোলবার জন্য। নারকেল বেড়িয়া নামক গ্রামে বাঁশ দিয়ে এই দুর্গ নির্মিত হয়। এরই নাম বাঁশের কেল্লা। এই কেল্লায় তিতুমীর সৈন্যদের নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকেন। এই বাঁশের দুর্গ কেমন ছিল তার বর্ণনা শুনলে অবাক হতে হয়। চারিদিকে বাঁশের সঙ্গে বাঁশ বেঁধে পুরু দেয়ালের মতো করা হয়েছিল।



## পাখ্‌তুনিস্তানের দামাল ছেলে

# হরিকিশন

পাখ্‌তুনিস্তান—উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। অধুনা পাকিস্তানের অন্তর্গত একটি অঙ্গরাজ্য। জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে এই রাজ্যের অধিবাসীদের—পাখ্‌তুনদের অবদান চির ভাস্বর হয়ে থাকবে। উক্ত রাজ্যের সর্বজনমান্য নেতা খান আবদুল গফুর খান সেদিনের ইংরাজ শাসনাধীন ভারতের প্রথম সারির জাতীয় নেতাদের অন্যতম। তিনি সীমান্ত গান্ধী নামে সমধিক পরিচিত।

স্থানীয় অধিবাসীরা ইংরাজ শাসন মাথা পেতে মেনে নিয়ে নিশ্চেষ্ট থাকেনি। বিভিন্ন গোষ্ঠীজাতিতে বিভক্ত হলেও তারা ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আঘাত বার বার হেনেছে। ইংরাজ কর্তৃপক্ষ বিরাট সৈন্যবাহিনী সেখানে সব সময়ই মোতায়েন রাখত। এমন কি উড়োজাহাজ থেকে বোমা ফেলে তাদের গ্রাম উড়িয়ে দিতে, প্রাণে মারতে এতটুকু দ্বিধা করত না। অনেক সময় কোন ঘটনা সে অঞ্চলে না ঘটলেও বিমান বাহিনীর শিক্ষার্থীদের শিক্ষণের জন্য উড়েজাহাজ থেকে বোমা ফেলে প্রচার চালাতো যে অধিবাসীর নানাস্থানে সরকারী শিবির আক্রমণ করে পাহাড় এলাকায় পালিয়ে গিয়েছে।

এই পরিবেশেই পেশোয়ার শহরের কিছু দূরে এক গ্রামে ভূমিষ্ট হয় হরিকিশন, পাখ্‌তুন পড়শীদের মাঝেই। পেশোয়ার ছিল তখন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের রাজধানী।

শৈশব পেরিয়ে কৈশোর আর যৌবন সন্ধিতে এসেই হরিকিশন সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে নানা খেলায় মত্ত হত। দুষমণ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করা ছিল তাঁদের সবচেয়ে পছন্দসই খেলা। গুলতি, পাথরের চাঙড়, লাঠি এ সবই ছিল তাদের লড়াই-লড়াই খেলার হাতিয়ার।

পড়াশুনা তেমন কিছু না করলেও হরিকিশন ছিল বুদ্ধিমান। কাজ-কর্মের মধ্য দিয়ে আর বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছ থেকে নানা কথা কাহিনী শুনে যে শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ হত তা আত্মস্থ করতে পারত হরিকিশন সেই বয়সেই।

চাষাবাদ তাঁদের ছিল। সেইজন্য হরিকিশন গরীবদের তুচ্ছ করত না। বরং স্থানীয় ভূ-স্বামী নবাব সাহেবের নিকট প্রায়ই পাখ্‌তুনদের নানা অভাব অভিযোগ নিজে গিয়ে পেশ করত। পাখ্‌তুনরা নবাব সাহেবকে ভয় করত। তারা তাঁর সামনে গিয়ে সালাম করে মাথা নিচু করে মাটির দিকে নীরবে তাকিয়ে থাকত। হরিকিশন কিন্তু তাঁর তারুণ্যের তেজে ভরা চোখ দুটি নবাব সাহেবের মুখের উপর স্থির রেখে মানুষের অভাব-অভিযোগের কথা বলত। দৃঢ় সাহসিকতার সঙ্গেই নবাব সাহেবকে অনুরোধ করত সেই সব অনাচার ও অন্যায় দূর করার জন্য। বহু ক্ষেত্রে ফলও হয়েছে। তাই হরিকিশন হয়েছিল পাখ্‌তুনদের আপনজন। তাঁরা হরিকিশনকে আদর করে ডাকত 'নায়ক' বলে।

বাবা লালা গুরুদাসের নিকটই পেয়েছিল এই নির্ভীকতার শিক্ষা। বাবা তাকে কৈশোরেই যেমন

দিয়েছিলেন অস্ত্র শিক্ষা তেমনই শিখিয়েছিলেন যে তাদের ঐ পাথুরে পাহাড়ের রুক্ষ, কর্কশ বাতাবরণে নির্ভীক ও সাহসী হতে হবে বাঁচতে হলে। আরো শিখিয়েছিলেন যে তাদের পায়ের নীচের কঠিন মাটিকে নরম করে সবুজ সজীব করতে হলে স্থির ধৈর্যে খাটতে হবে। তবেই তারা সবাই মিলে জীবন ধারা জিইয়ে রাখতে পারবে। হরিকিশনের জীবনধারা এই প্রবাহ পথেই বয়ে চলছিল।

তাঁদের গ্রাম্য জীবনে এল এক নতুন জোয়ার। স্বাধীনচেতা পাখ্‌তুনরা ফিরিঙ্গী রাজের বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলন জারি হয়েছে শুনে উদ্বেল হয়ে উঠলো। সময়টা হল ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ইংরাজী-এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহ। হরিকিশনও আজাদীর লড়াই স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম শুরু হবার খবর পেয়ে তাতে শরিক হবার জন্য মেতে উঠলো। গ্রামের তরুণ যুবাদের নিয়ে গড়ে তুলল নব-জীবন ভারত সভা। লাল কোর্তা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীও গঠন করল। গ্রামের প্রধানদের সংগে পরামর্শ করে তারা স্থির করলে যে তাদের গ্রামের একটা দল পেশোয়ার গিয়ে সেখানকার লালকোর্তা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সংগে মিলে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করবে।

সেদিনটি ছিল ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল। পেশোয়ার শহরের কাবুলী ফাটকের সামনের বিরাট চত্বর। কিস্‌সাখানীও বলত স্থানটিকে। লালকোর্তা স্বেচ্ছাসেবকরা গোটা চত্বর জুড়ে সরকারী নিষেধ আজ্ঞা অমান্য করে বসে আছে। তাঁরা ছিল ধীর ও শিষ্ট। শুনছিল গভীর মনযোগে তাদের নেতাদের ভাষণ। চারিপাশের গলি, রাস্তা আর বাড়ীর ছাদে কৌতূহলী মানুষের ভীড়। এমন কি বোর্‌খা ঢাকা নারীরাও গৃহকোণের অবরোধ থেকে বেরিয়ে এসে সেই মানুষের ভীড়ে উপস্থিত ছিল।

এই শান্ত, শিষ্ট সমাবেশে ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল ইংরাজ শাসন কর্তৃপক্ষ গাড়ওয়াল ফৌজের একটি বাহিনীকে সেখানে জড় করে। শুধু তাই নয় গোরা পল্টনও মোতায়েন করেছিল তারা।

এই থমেথমে আর তটস্থ অবস্থার মাঝে এসে দাঁড়াল হরিকিশন আর তার গাঁয়ের সাথীরা। এই বিরাট জমায়েত, এমন মহতী সমাবেশ তারা দেখতে পাবে তা কল্পনাও করেনি। অবাক বিস্ময়ে, মুগ্ধ দৃষ্টিতে তারা দেখছিল চত্বরে উপবিষ্ট লালকোর্তা স্বেচ্ছাসেবকদের। তাদের মাঝে গিয়ে তারাও আসন নেবে কিনা ভাবছিল।

সঙ্গের একজন সাথী শুধালো হরিকিশনকে, "নায়ক, এইসব ফৌজী সিপাহী রাইফেল নিয়ে দাঁড়ান কেন? গোরা পল্টনও হাজির। গুলি চালাবে কী?" হরিকিশনও লক্ষ্য করেছে। ইংরাজ সরকার কেন এই আয়োজন করেছে সে প্রশ্ন তার মনেও এসেছে। কিন্তু এর কী ও কেন ঠাওর করতে পারছিল না।

শুনতে পেল কর্কশ কণ্ঠে, বাজখাই আওয়াজে গোরা ইংরাজ অফিসার হুকুম করেছে, "আভি, তুরন্ত ভীড় হটাও ইয়নি গোলি চলেগি। তিন মিনট টেইম্।"—অর্থাৎ এখুনি ভীড় ছেড়ে চলে যাও সবাই। নইলে গুলি চলবে—। তিন মিনিট সময় দিলাম।

চার পাশের কৌতূহলী জনতার মাঝে চাঞ্চল্য জাগে। কারো কারো কণ্ঠে প্রতিবাদের অস্পষ্ট ধ্বনি উঠে।

গোরা অফিসার হাত-ঘড়ির দিকে নজর রেখে গুনছিল—এক—দুই……।

লালকোর্তা স্বেচ্ছাসেবকরা ধীর, শান্ত এবং প্রত্যয়ে দৃঢ় মুখে যেমন বসেছিল তেমনই রইল।

গোরা অফিসার শুন্‌ল 'তিন'। কণ্ঠস্বর উচ্চপর্দায় তুলে হুকুম করল—"গাড়ওয়াল ফায়ার থ্রী রাউণ্ড"—

প্রথম হাবিলদার তার প্লেটুনকে হুকুম শুনাল 'গাড়ওয়াল গুলি কোরো না'। পর-পর-আর-আর হাবিলদাররা একই হুকুম করল—'গাড়ওয়াল গুলি কোরো না।'

গোরা অফিসারের লাল মুখ হল আরও লাল। কটা চোখের রক্তাভ হল আরো রক্ত রাঙা। এই প্রত্যক্ষ অবাধ্যতায় তার মুখে কথা যোগাল না। রাগে সে ফুঁসতে লাগল।

অপেক্ষমান জনতা প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারেনি। হঠাৎ সেই বিরাট সমাবেশ শত কণ্ঠের ধ্বনিতে লহরিত হয়ে উঠ্‌লো—"গাড়ওয়াল হামারা ভাই হ্যায়। গাড়ওয়াল ভাইয়োঁ। জিন্দাবাদ—খোদা উন্‌হে সহি-সালামৎ রাক্খে—" উল্লাসে তালি বাজিয়ে গাড়ওয়াল বাহিনীকে অভিনন্দন জানাল।

গোরা পল্টন এসে দাঁড়াল রাইফেল তাক্ করে। গাড়ওয়াল বাহিনীকে আর এক দল গোরা পল্টন দৌড় করিয়ে সেখান থেকে নিয়ে গেল।

না কোন হুঁশিয়ারী, না কোন পুনঃ হুকুম। শুরু হল এলোপাথারি গুলি।

ঘটনার এই অভাবনীয় পরিবর্তনে জনতা এদিক-ওদিক ছুটতে লাগল দিশাহারা হয়ে।

সময়ের জ্ঞান ছিল না হরিকিশনের। না ছিল পূর্ণ চেতনা তাঁর। চেতনা ফিরতে অনুভব করল বাচ্চা ছেলেটি তার বুকে লেপটে আছে। থেকে-থেকে কাঁপছে। আর ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে। মনে পড়ল মুহূর্তের সেই ঘটনা।

চার-পাঁচ বছরের ছেলেটি। উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে যাচ্ছিল। বোধ ছিল না যে সে গুলির ঝাঁকের মাঝে পড়ছে। হরিকিশন ঝট্ করে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে মাটিতে শুয়ে পড়ে। এখনো অনুভব করছে পাগড়ী ঘেঁসে গুলি চলে যাওয়া। অনুভব করছে কানের ডগায় গুলির উত্তাপ যেন।

কানে আসে নারী কণ্ঠের করুণ আর্তনাদ।

শুনতে পায় বেদনাক্লিষ্ট নারীকণ্ঠের করুণ ডাক—বেটা, মুস্তাকিম, মেরী লাল। মায়ের ডাক বুঝতে পেরে বাচ্চা ছেলেটি আবেগভরা গলায় জবাব দেয় "আম্মা"। হরিকিশন ছেলেটির ডাকে গলা মিলিয়ে তাদের দিকে আসতে বলে মহিলাকে। পাগলের মতো ছুটে এসে মুস্তাকিমকে বুকে জড়িয়ে ধরে। অঝরে ঝরতে থাকে তার চোখের জল।

রাইফেল উঁচিয়ে গোরা সেনা সেদিকে আসছে দেখে হরিকিশন মহিলাকে সরে যেতে বলে। নিজেই বুক ফুলিয়ে গোরা সেনাদের সামনে গিয়ে বলে—"গুলি করবে, কর।" নিজের বুকের মাঝে দেখিয়ে দেয়।

গোরা সেনারা ঘিরে নিয়ে চলল। হরিকিশন দেখতে পেল তার গাঁয়ের সাথীদের দূরে একটি বাড়ির দেউড়ীতে আরো কয়েকজন লোকের মাঝে দাঁড়ান।

থানায় বন্ধ করল তার মতো আরো অনেককেই। পরদিন আদালতে হাজির করল তাদের। বিচারক হাকিম হরিকিশনকে দণ্ড দিল দেড় বছর কারাবাসের।

পেশোয়ার জেল থেকে লাহোর জেলে স্থানান্তরিত হল হরিকিশন।

পেশোয়ার থেকে লাহোর, এই সারা যাত্রা পথ তাঁর কানে নিয়ত ধ্বনিত হয়েছে রোষ আর ঘৃণা মেশানো জনতার সেই অভিসম্পাত—কাতিল, কাতিল। হরিকিশনের হৃদয় কঠিনতর হচ্ছিল 'কাতিল'দের সমুচিত দণ্ড দেবার জন্য। লাহোর জেলে পৌঁছেও অন্য সব ভাবনা ছেড়ে তার মনে শুধু গুঞ্জিত হল—শাস্তি দিতে হবে, দণ্ড দিতে হবে, কাতিলদের ক্ষমা নেই—।

কিছুদিন যেতেই হরিকিশনের পরিচয় হল একজন বিপ্লবী স্বাধীনতা কর্মীর সংগে। তারা অনেকেই ছিল বিচারাধীন। ঝুলছিল তাদের বিরুদ্ধে নানা অস্ত্র রাখার মামলা, ষড়যন্ত্র মামলা।

দিল্লী আইন সভায় ভগৎ সিং তাঁর বিপ্লবী সহযোগী বটুকেশ্বর দত্ত যে বোমা ফেলেছিল ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে জানাল সে বিবরণ হরিকিশন। জানল সেই অমরধ্বনি—ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ—বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক্‌। ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্ত আইন সভায় বোমা ফেলার সময় প্রথম এই ধ্বনি—ইন্-কিলাব জিন্দাবাদ, দিয়েছিল।

হরিকিশনের চোখের সামনে এক দুনিয়ার মূল দরজা খুলে গেল। সে অন্তরে-অন্তরে বুঝতে পারল জীবন বলিদানের রক্ত রাঙা পথ পেরিয়েই প্রভাতের আবাহন গান গাইতে হবে।

হরিকিশন জানতে পারল তাঁকে শিগগিরিই ছেড়ে দেওয়া হবে জেল থেকে। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে লাহোরে কোথায় যাবে, কার সঙ্গে দেখা করবে, সে সব খবর জেনে নিল সেই ঘনিষ্ঠ বিপ্লবী কর্মীর নিকট হতে।

নির্দিষ্ট দিনে ছাড়া পেয়ে লাহোরের 'মিলাপ' পত্রিকার অফিসে গিয়ে উঠলো হরিকিশন। জেল থেকে যাঁর কথা বলে দিয়েছিল তার দেখা পেল ঐ অফিসে। হরিকিশনকে তাদের একজন পরিচিত ও বিশ্বাসী বন্ধুর বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে থাকবার ব্যবস্থা করলেন।

দু'দিন পর স্থির হল কাজের সূচী। স্থির হল পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন্ন সমাবর্তন অনুষ্ঠানে পাঞ্জাবের লাট সাহেব স্যার জিওফ্রেস্থ মণ্টমোরেনসী উপস্থিত থাকবেন। সেখানে তাকে চরম দণ্ড দেওয়া হবে সেই সিদ্ধান্ত স্থানীয় বিপ্লবী নেতৃ কমিটি করেছে। এবং হরিকিশনকে এই দণ্ডাজ্ঞা কার্যকর করতে হবে।

হরিকিশন নিজেকে আর রোধ করতে পারল না। আনন্দ-আবেগে সেই বিপ্লবী কর্মীকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রবেশ করার অনুমতিপত্র সংগৃহীত হল। আগ্নেয়াস্ত্র অর্থাৎ রিভলভারও যোগাড় হল।

যথাবিধি রিভলভার সযত্নে পোষাকের নিচে কোমরে গুঁজে হরিকিশন সমাবর্তন সভায় পৌঁছে আসন গ্রহণ করল। তারিখটি ছিল, ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ।

লব্ধ প্রতিষ্ঠ দার্শনিক এবং শিক্ষাবিদ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ছিলেন সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা। পরবর্তী কালে তিনি স্বাধীন, সার্বভৌম ভারত প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি আর জীবিত নেই।

ভাষণ শেষ করে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ মঞ্চ থেকে নেমে যাবার জন্য পা বাড়ালেন। লাট সাহেবও উঠে দাঁড়াল।

হরিকিশন বুঝল বিপ্লবী দণ্ডাজ্ঞা কার্যকর করার হল এই সময়। সে মঞ্চের দিকে এগিয়ে গিয়ে লাট সাহেবকে তাক করে রিভলবার থেকে গুলি চালাল। লাট সাহেব হাতে এবং পিঠে গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। বিপ্লবী দণ্ডাজ্ঞা নিশ্চিতভাবে সার্থক করার জন্য আবার লাট সাহেবকে লক্ষ্য করে গুলি করল। একজন পুলিশ অফিসার সেই গুলিতে বিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। হরিকিশন-এর কঠিন ও দৃঢ় হাতের মুঠোয় রিভলভার তখনও উদ্যত। গুলি লাগল হরিকিশনের। আহত হয়ে পড়ে গেল হরিকিশন। লাট সাহেবের গোরা দেহরক্ষীরা হিংস্র ক্রোধে হরিকিশনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তেজদীপ্ত উদাত্ত কণ্ঠে হরিকিশন বলছিল—কাতিল, জল্লাদ, মাফি নেই, ক্ষমা নেই তোমাদের—

তারপর যা হয়ে থাকে তাই হল। আদালতে বিচার হল যেমন হয়ে থাকে। অভিযোগ ষড়যন্ত্র, বে-আইনি অস্ত্র রাখা, হত্যা। মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত হল হরিকিশন। তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল মিয়াওয়ালি জেলে। এখন এই জেল পাকিস্তানের অন্তর্গত।

বিপ্লবী কর্মীরা উচ্চ আদালতে, হাইকোর্টে আপিল করল। কিন্তু মৃত্যুদণ্ড রদ হল না। নিম্ন আদালতের রায়-ই বহাল রইল।

এসে গেল এ জীবনের খেলা শেষ করার সেই দিনটি ৯ই জুন ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ।

আনন্দ ঘন হৃদয়ে হরিকিশন ফাঁসীর মঞ্চের দিকে পা বাড়াল। ঊষা তাকে প্রত্যুষের প্রথম আলোর ধারায় নাইয়ে দিল। তাঁর উজ্জ্বল চোখ দুটিকে দেখাচ্ছিল শুকতারার মত—।

কালো কাপড়ে মুখ কাঁধ ঢেকে দিল হরিকিশনের। পূর্ণ চেতনায় ফাঁসীর মঞ্চে আরোহণ করল হরিকিশন।

দূরের ছোট্ট গাছটিও যেন মাথা নত করে নিথর নীরবতায় শেষ বিদায় জানাচ্ছিল হরিকিশনকে।

[ সংক্ষেপিত ]

[ প্রধান স্বাধীনতা সংগ্রামী আন্দামানে দ্বীপান্তরিত শ্রীযুক্ত সত্যব্রত চক্রবর্তী মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত। ]

# অনুশীলনী

## ক্ষুদিরাম

১। কিংসফোর্ড কে ছিল ? তাকে বিপ্লবীরা বন্ধু মনে করত না শত্রু মনে করত এবং কেন ?
২। ক্ষুদিরাম কোথায় ধরা পড়েন ?
৩। কিংসফোর্ডকে হত্যা করার দায়িত্ব কার উপর পড়েছিল ?
৪। অরবিন্দের নেতৃত্বে কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টা কি সফল হয়েছিল ?
৫। কিংসফোর্ডকে হত্যার জন্য কারা বোমা তৈরী করে ?
৬। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল মজঃফরপুরে কি ঘটেছিল ?
৭। ক্ষুদিরামকে ফাঁসি দেওয়ার পর কোন্ গান সবার মুখে মুখে শুনা যায় ?

## মথুরা সিং

১। ডাঃ মথুরা সিং কোথাকার লোক ছিলেন ? গদর পার্টির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কি ছিল ?
২। মথুরা সিং কোন্ গ্রামে কোন্ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ?
৩। তিনি বিদেশে কোন্ কোন্ দেশে গিয়েছিলেন ?
৪। মথুরা সিংকে কোথায় গ্রেফতার করা হয় ?
৫। মথুরা সিং-এর মৃত্যু কত খ্রীষ্টাব্দে কোন্ তারিখে হয়।
৬। আফগানিস্তানের সরকার ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করেছিলেন।

## দীনেশচন্দ্র গুপ্ত

১। দীনেশের কাছে মৃত্যু কি ছিল ?
২। দীনেশচন্দ্র অহিংসায় বিশ্বাসী না বিপ্লবে বিশ্বাসী ?
৩। দীনেশচন্দ্র গুপ্ত কত বৎসর বয়সে ফাঁসির মঞ্চে উঠেন ?
৪। দীনেশচন্দ্র কোন্ জেলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন ?
৫। দীনেশচন্দ্র কি বি.এ. পরীক্ষা দিতে পেরেছিলেন ?
৬। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর রাইটার্সে কি ঘটেছিল ?
৭। দীনেশচন্দ্র কি লেখা-পড়া ও খেলাধূলা ভালোবাসতেন।
৮। এই ঘটনার বিবরণ সংবাদপত্রে কিভাবে বেরিয়েছিল ?
৯। কোন্ কোন্ যুবক এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন ?
১০। দীনেশচন্দ্রের কত তারিখে ফাঁসি হয় এবং তিনি কাকে চিঠি লিখেছিলেন।
১১। সতীশচন্দ্র কে ছিলেন। দীনেশচন্দ্র তাঁর বাবার কত নম্বর পুত্র ছিল ?

## ভগৎ সিং

১। ভগৎ সিং-এর প্রিয় নেতা কে ছিলেন ?
২। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার নায়ক কে ছিলেন ?
৩। বটুকেশ্বর দত্তের সহিত ভগৎ সিং-এর কোথায় যোগাযোগ হয় ?
৪। ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত এবং অজয় ঘোষ ব্যায়ামাগার গঠন করলেন কেন ?
৫। অজয় ঘোষের সঙ্গে ভগৎ সিং-এর সাক্ষাৎ কোথায় হয় ?

৬। কংগ্রেস যে দুটি দলে বিভক্ত হয়েছিল তার নাম কি ?
৭। সাম্যবাদী সাহিত্যের পুস্তিকা কোত্থেকে আমদানি হচ্ছিল ?
৮। নওজওয়ান ভারতসভার প্রতিষ্ঠাতা বা গঠন দাতা কে ?
৯। ইংরেজরা হাজার চেষ্টাতেও "কাকোরী" ষড়যন্ত্রের মামলার কোন্ আসামীকে ধরতে পারেন নি ?
১০। হিন্দুস্থান সোসালিস্ট কে গঠন করেন ?
১১। সাইমন কমিশন কবে এসেছিল।
১২। চন্দ্রশেখর আজাদের সঙ্গে সাক্ষাত করে ভগৎ সিং-এর কর্ম ক্ষমতা কত গুণ বেড়ে গিয়েছিল ?
১৩। পুলিশের হাতে মার খেয়ে লালা লাজপত রায়ের মৃত্যু হওয়ার ফলে কি পরিণতি হয়েছিল। এতে ভগৎ সিং-এর আদর্শ কতখানি ?

## মাস্টারদা সূর্য সেন

১। সূর্য সেনকে মাস্টারদা বলা হয় কেন ?
২। নাগর খানাপাহাড়ে পুলিশের হাতে কে ধরা পড়েন ? বিচারে তাঁর কি শাস্তি হয় ?
৩। ভারতে কত খ্রীষ্টাব্দে কে সশস্ত্র বিপ্লবের বীজ বপন করেন ?
৪। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল রাত্রিটা কিজন্য বিখ্যাত ? ঘটনাটির বর্ণনা দাও।
৫। অস্ত্রাগার লুন্ঠন করেও বিপ্লবীরা পরিকল্পনা মত কাজ করতে পারল না কেন ?
৬। ব্রিটিশ সরকার কিভাবে বিপ্লবীদের মোকাবিলা করেছিল ?
৭। সূর্য সেন কিভাবে ধরা পড়েন ?
৮। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠনের পর কে কে শহীদ হন ?
৯। বিচারে সূর্য সেন ও তাঁর সঙ্গীর কি দণ্ডাদেশ হয় ?
১০। সূর্যসেন তাঁর সাথীদের জন্য যে শেষ বাণীটি পাঠিয়েছিলেন তাহা লিখ।

## সাগর পারের শহীদ ধিংরা

১। ইণ্ডিয়া হাউস কোথায় অবস্থিত ?
২। আয়ারের প্রশ্নের উত্তরে ধিংরা বলেছিলেন ?
৩। দামোদর সাভারকর কে ছিলেন ?
৪। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের স্বুবর্ণ জয়ন্তী ইণ্ডিয়া হাউস কিভাবে পালন করে ?
৫। কার্জন উইলি কে ছিলেন ?
৬। কার্জন উইলি কোথায় কিভাবে ধিংরা হত্যা করেন।
৭। চার্চিল ধিংরার ঘোষণা পত্রকে কি আখ্যা দেন ?
৮। ধিংরার ঘোষণা পত্রে কি লেখা ছিল ?
৯। বিচারকদের প্রশ্নের উত্তরে ধিংরা কি বলেন ?
১০। কত খ্রীষ্টাব্দে এবং কোথায় ধিংরার ফাঁসী হয় ।
১১। শহীদ হওয়ার সময় ধিংরার বয়স কত ছিল?

## চাপেকার ভাতৃত্রয় ও রাণাডে

১। চাপেকার ভাই তিনজনের নাম লিখ।

২। র‍্যাণ্ড ও আর্নেষ্ট কে ছিলেন ?

৩। দামোদর চাপেকারের ফাঁসী কেন হয় ?

৪। র‍্যাণ্ড ও আর্নেষ্টকে বিপ্লবীরা কেন আক্রমণ করেন ?

৫। বাসুদেব চাপেকারের ফাঁসী কোথায় হয় ? কত তারিখে ফাঁসী হয় ?

৬। রানাডের পুরো নাম কি ? ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা কি ছিল ?

## বিদ্রোহ বিশ্বনাথ

১। বিশ্বনাথ কে ছিলেন ?

২। কৃষক আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা কিরূপ ছিল ?

৩। বিশ্বনাথ কিভাবে ধনী অত্যাচারীদের শায়েস্তা করেন ?

৪। নীলকর সাহেবকে বিশ্বনাথ ক্ষমা করেছিলে কেন ?

৫। ফ্যাগীকে ক্ষমার প্রতিদানে বিশ্বনাথকে কি করেছিল ?

৬। ইংরেজেরা বিশ্বনাথের কিরূপ বিচার করেছিল ?

## সাওতালনেতা সিধু

১। সিধু কোন্ অঞ্চলের লোক ছিলেন ?

২। সিধু কেন বিদ্রোহী হন ?

৩। সশস্ত্র শাসকের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াইয়ের অস্ত্র কি ছিল ?

৪। সিধু কি বলে সাঁওতালদের বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুপ্রাণিত করেছিলেন ?

৫। সাঁওতালেরা তাদের সাথীদের কিভাবে বিদ্রোহের খবর পাঠাত ?

৬। সিধুর সংগ্রামে সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লেখ।

৭। সিধু কিভাবে ধরা পড়েন ? বিচারে তাঁর কি শাস্তি হয় ?

## মঙ্গল পাণ্ডে

১। সিপাহী বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলা হয় কেন ?

২। প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়ক কে ছিলেন ?

৩। সিপাহীদের অসন্তোষের কারণ কি ছিল ?

৪। রাম ধারী সিং কে ছিলেন ?

৫। মঙ্গল পাণ্ডে কি করে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন ?

৬। মঙ্গল পাণ্ডের হাতে নিহত ইংরজ পুরুষ কে ছিলেন ?

৭। মঙ্গল পাণ্ডে কি ভাবে ধরা পড়েন ?

৮। মঙ্গল পাণ্ডের কত খ্রীষ্টাব্দে ফাঁসী হয়।

## পাখ্তুনিস্তানের দামাল ছেলে হরিকিশন

১। হরিকিশন কি ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেন ?

২। হরিকিশন কোন জায়গার অধিবাসী ছিলেন ?

৩। হরিকিশন কি ভাবে একটা বাচ্চা ছেলেকে বাঁচিয়েছিলেন লেখ।

৪। হরিকিশনের ফাঁসী হয় কেন ?

৫। হরিকিশনের কত খ্রীষ্টাব্দে ফাঁসী হয়।